ভদ্র সিরিজ—১

রহস্যময় চোর

শ্রীসুধাকান্ত দে,
এম. এ., বি. এল.

কলিকাতা
১লা ফাল্গুন
১৩৫৮

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

প্রকাশক : শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ
৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা—৯

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী :

১। প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার (২য় সং)
২। রুধিরে আঁকিনু আলপনা
৩। রোগীর জগৎ
৪। পয়লা আষাঢ়
৫। ক্ষুধিত আত্মা
৬। জন্ম-জন্মান্তর
৭। উপক্রম
৮। (রিকার্ডোর) অর্থনীতি ও করতত্ত্ব
৯। (প্লেটোর) রিপাবলিক
১০। বণ্টন-তত্ত্বের মুখবন্ধ

মুদ্রাকর : শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ
৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা—৯

রহস্যময় চোর

১। ছেলে-চুরি

বাংলা দেশে পুলিশের প্রতাপ বেশি। লোকে পুলিশকে যে পরিমাণ বিশ্বাস করে, তার চেয়ে বেশি অবিশ্বাস করে। তবে সাধারণত চুরি বা ঐরূপ অপরাধের জন্য লোকে পুলিশের শরণাপন্ন হয়। বড় জোর ডিটেক্‌টিভ বিভাগ পর্যন্ত যায়। সচরাচর সখের ডিটেক্‌টিভের কথা বড় শোনা যায় না এবং সম্ভবত ও-ব্যবসা চলে না। কারণ কজন লোকই বা ঐরূপ ব্যক্তির শরণাপন্ন হইতে পারে? আর এইরূপে রোজগারই বা কত হইতে পারে? সুতরাং নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি যখন সোমনাথ বাবুর চোখে পড়িল, তখন তিনি মনে মনে হাসিয়াছিলেন বই কি। হাসিবার কারণ অনেকগুলি ছিল। তার মধ্যে একটি বিজ্ঞাপনদাতার নির্বুদ্ধিতা, এবং অন্যটি বিজ্ঞাপন দেওয়ার কায়দা। দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইয়াছিল।

"এমন অনেক ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা আছেন, যাঁরা বিশেষ কারণ বশত পুলিশী সহায়তা লইয়া কোন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে বা অপরাধীকে ধরিতে ইচ্ছুক

নহেন। তাঁরা নিম্ন ঠিকানায় আমার সহিত দেখা করিতে পারেন। যদিও পুলিশের সাহায্য লওয়া বা যোগাযোগ রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে, আমরা সকল অনুসন্ধান অত্যন্ত গোপনে চালাই এবং এ পর্যন্ত আমরা কোন ব্যাপারে বিফল হই নাই। আমাদের চার্জ বেশী নয়। ইতি ভদ্র, পোষ্ট বাক্স নং ৭২৩।”

পোষ্ট বাক্সে কেহ যেন গিয়া দেখা করিতে পারে! সোমনাথ বাবুর হাসির ইহাও কারণ। কিন্তু তখন কে জানিত এই সোমনাথ বাবুকেই একদিন এমন ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইবে যে, চোখের জলের মধ্য দিয়া তিনি ভদ্রের নিকট রহস্যের সমাধানের জন্য উপস্থিত হইবেন!

কিন্তু তাই হইল।

সোমনাথ কলিকাতায় একজন বড় উকীল। মাসে পাঁচ ছশ টাকা উপার্জন করেন এবং সেই চালে থাকেন। বেশি বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁর স্ত্রীর সৌন্দর্য-খ্যাতি রহিয়াছে। লোকে বলে সোমনাথ সুন্দরী স্ত্রীকে অত্যন্ত বেশি ভালবাসেন। অত্যন্ত বেশির কোন মাত্রা নাই। সুতরাং তা লইয়া আলোচনা চলে না। একটি মাত্র পুত্র সন্তান। বয়স দুই বৎসর। কথা বলিতে শিখিয়াছে, আর হাঁটিতেও।

১৩৪৫ সালের মাঘ মাস। একদিন সোমনাথ বৈকালে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছেন এবং মনের আনন্দে ধূম

পান করিতেছেন, অদূরে বালকটি নানাভাবে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টায় বিফল হইতেছে, হয়তো কোন মোকদ্দমার কথা বিশেষভাবে ভাবিতেছেন, এমন সময় এক জরুরি তার আসিল। ঢাকা হইতে এক উকীল-বন্ধু তার করিয়াছেন, শীঘ্র এস। এখানে একটি বড় মোকদ্দমার ভার তোমায় লইতে হইবে।—রমাপ্রসাদ।

রমাপ্রসাদ সোমনাথের বাল্যবন্ধু। তার পাইয়া সেকালের অনেক কথা তাঁর মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল। দুজনে একত্র কত অধ্যয়ন, কত স্বপ্ন দেখা, কত আদর্শ লইয়া মারামারি। সেই সব দিন যেন আবার ফিরিয়া আসিল। মোকদ্দমার জন্য যত না হোক্ বন্ধুকে দেখিবার জন্য মনের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। রমাপ্রসাদও একদিন কলিকাতায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু এখানে কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি ঢাকায় গিয়া ওকালতি সুরু করেন। সেখানে পসার মন্দ হয় নাই।

সোমনাথের ঢাকা রওনা হওয়ার কথা শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, কতদিনের জন্য যাওয়া হবে?

সোমনাথ হাসিলেন। মৃদু মধুর হাসি, যা তাঁর স্বভাব। কি করে বলি, কতদিন লাগবে। কি ধরণের মোকদ্দমা, কি করতে হবে, কিছুই তো জানি না। সেখানে না পৌছে কিছুই বলা সম্ভব নয়। চিঠি লিখব 'খন।

সোমনাথ-গিন্নী হয়তো মনে মনে বলিলেন, তবেই

আমায় কৃতার্থ করবে আর কি। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, উঠবে কোথায়?

—কেন, বন্ধুর বাড়ি থাকতে আর কোথাও ওঠা চলবে না কি।

—বন্ধুর বাড়ি উঠতে পার, কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকা ভাল দেখাবে না। ডাক-বাংলো নেই?

—ষ্টেশনের কাছেই তো ডাক-বাংলো। দরকার হলে সেখানে থাকা যাবে।

—তাহলে আমাদেরও নিয়ে চল না।

—সে কি!

—কেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? আমি কোনদিন ঢাকা দেখি নি। আছি তো কল্‌কাতায় বন্ধ হয়ে। একটু ঘুরে আসাও হবে। তুমি অমত কোর না।

সুতরাং সোমনাথকে তৈরি হইয়া লইতে হইল। পরদিন স্ত্রীপুত্রসহ তিনি শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলেন। তিনি জানিতেন, রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় ঢাকার গাড়ি ছাড়ে। তিনি আগেই লোক দিয়া দুইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটাইয়া আনিয়াছিলেন। রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর ধীরে ধীরে তিনি রওনা হইলেন। চাকর রামধন আগেই মালপত্র লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়াই জানিতে পারিলেন, গাড়ি ছাড়িবার সময়ের

পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সওয়া-নটার সময় ছাড়িয়া গিয়াছে। রামধন মালপত্রের সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া আছে।

উপায় কি? ঢাকার গাড়ী আবার পরদিন রাত্রি সওয়া-নটার সময়। যদি তিনি কাল রাত্রে রওনা হন, তা হইলে পৌছিবেন পরশু তিনটার সময়। অথচ তাতে কাল ও পরশু দুদিন মাটি হইবে। ষ্টেশনে অনেক খোঁজ করিলেন। কিন্তু যদি বা কতকগুলি ট্রেণ পাওয়া গেল, সেগুলি গোয়ালন্দ পর্যন্ত যায়। তারপর গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জগামী কোন ষ্টীমার ধরিতে পারা যাইবে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত ভরসা কেহ দিতে পারিল না। যোগাযোগ না থাকিলে কোন না কোন চরে পড়িয়া রাত কাটাইতে হইবে, ভাবিতেও সোমনাথের গা ছমছম্ করিয়া উঠে। একমাত্র উপায় দেখা গেল, কাল সকাল দশটার সময় একটা গাড়ী ছাড়িবে—সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার। অনেক উঠা-নামা করিয়া সেই পথে মৈমনসিংহ ঘুরিয়া ঢাকা যাওয়া চলে। ঢাকায় পর দিন দশটার সময় পৌছিবার কথা। ইহা মন্দের ভাল, যদিও মৈমনসিংহে রাত্রি ১ টার সময় পৌছিয়া ঢাকাগামী গাড়ির জন্য ঘণ্টা চারেক অপেক্ষা করিতে হয়। অগত্যা সোমনাথ এই কষ্ট স্বীকার করিতে রাজি হইলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোন আপত্তি নাই তো।

—আমার আবার আপত্তি কি।

পরদিন সকাল বেলা দশটার সময় সোমনাথ আসিয়া স্ত্রীপুত্র সহ এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন। ভৃত্য রামধন এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরা দখল করিল।

সোমনাথকে অনেকবার ঢাকায় আসিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি প্রতিবারই মামুলি পথে আসিয়াছেন। এইবার শুধু ব্যতিক্রম হইল। এ পথ অপরিচিত বলিয়া নূতনতর দৃশ্য ও সৌন্দর্য তাঁর আনন্দ-বর্ধন করিল। একবার ফুলছুড়ি ষ্টেশনে ষ্টীমারে উঠিলেন, আবার জগন্নাথগঞ্জে ট্রেন ধরিলেন, তারপর রাত্রি একটার সময় মৈমনসিংহ ষ্টেশনে নামিলেন। সুখের বিষয়, সেখানে ঢাকাগামী গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা খুলাইয়া তাঁরা ঢুকিলেন। সঙ্গে ভৃত্য রামধনও রহিল। সোমনাথের একটা মুদ্রাদোষ এই যে, তিনি ট্রেণে উঠিয়া প্রথমত টর্চের আলোর সাহায্যে সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়া লন। বেঞ্চির নিচে, বাঙ্কের উপরে, পায়খানার ভিতরে কোথাও দেখিতে বাকি রাখেন না। এই রাত্রেও তার ব্যতিক্রম হইল না। একে রাত্রি কাল, তায় গাড়ীর বাতি যথেষ্ট আলো দেয় না। সুতরাং তিনি টর্চ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আলো ফেলিতে লাগিলেন। সোমনাথ-কুমার রামধনের কোলে দিব্য ঘুমাইতেছিল।

সোমনাথ-গিন্নী স্বামীর এই অভ্যাস লইয়া অনেক

উপহাস করিয়াছেন, কিন্তু ছাড়াইতে পারেন নাই। অনুরূপ করিলেন,

—কি যে তোমার বাই! কি দেখ, তুমিই জান।

ততক্ষণে সোমনাথের মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। তিনি একবার উঁকি মারিয়া ষ্টেশনের দিকে চাহিলেন। কোন দিক্ হইতে শীঘ্র কোন গাড়ি আসিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ষ্টেশন জনমানবশূন্য। গাড়ির কোন কামরাতে লোক আছে কি না বুঝা যায় না। থাকিলেও নিদ্রিত। সোমনাথ বলিলেন,

—আমরা বরং ষ্টেশনেই শুয়ে থাকি।

—কেন, ভয়টা কিসের?

এমন সময় দূরে পাহারা-ওয়ালার গলার আওয়াজ শোনা গেল। সোমনাথ-গিন্নী হয়তো তাইতেই খুব ভরসা পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু সোমনাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,

—কোন কিছু কি দেখতে পাচ্ছ না?

—কি আবার দেখ্‌ব।

—চোখে পড়ছে না?

—না।

তখন সোমনাথ গাড়ির মেঝেতে আলো ফেলিয়া বলিলেন, দেখ্‌ছ?

—দেখ্‌ছি যে গাড়িগুলি ধোয়া হয়েছে। তাই ভিজা রয়েছে।

—আর কিছু না ?

—না।

—ভাল করে দেখ। দেখতে পাবে, গাড়ির মধ্যে পায়ের দাগ রয়েছে।

সোমনাথ-গিন্নী ঠাহর করিয়া দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

—তুমি কেন উকীল হয়েছিলে ? তুমি খুব ভাল ডিটেক্‌টিভ্‌ হতে পারতে। কেন সে পথে গেলে না ?

সোমনাথ-গিন্নীর পরিহাস সোমনাথের অটল গাম্ভীর্যে লাগিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। সোমনাথ বলিলেন,

—তুমি কছুই বোঝ নি। যেগুলিকে পায়ের দাগ মনে করছ, সেগুলি কোন সাধারণ মানুষের পায়ের দাগ নয়। আমি শুধু ভাবছি, এমন যাদের বা যার পা তারা বা সে না জানি কি ধরণের জানোয়ার।

—যদি তাও হয়, তাহলে আমাদের ভয় পাবার কি কারণ আছে ? পুলিশকে ডাকলেই আসবে। তাছাড়াও সাহায্য পাবে। অনর্থক কেন ভয় পাচ্ছ ?

—ভয় ঠিক পাচ্ছি না। তবে এই পায়ের মালিকের সঙ্গে পুলিশ পেরে উঠবে কি না সন্দেহ। আমরাও হয়তো সাহায্য পাব না। থাকগে এস শুয়ে পড়ি। ও পুলিশ, তুমি একটু নজর রেখো চারিদিকে।

—জী।

—আর ওরে রামধন, তুই যেন নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়িস না।

—আজ্ঞে না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামী ও স্ত্রী ঘুমাইয়া পড়িলেন। বালক আগে হইতে ঘুমাইতেছিল। রামধনও বাদ গেল না। তখনও ভোর হয় নাই। ইঞ্জিন আসিয়া গাড়িতে লাগিল। ধাক্কাতে সোমনাথ চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, মা ও তাঁর কোলে ছেলে ঘুমাইতেছে, রামধন নিচে নিদ্রিত। ভৃত্যকে তিনি ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর কোন কামরাতে ঢুকিতে বলিলেন। রামধন তার কম্বলখানা লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে একবার প্রশ্ন জাগিল, রামধন ছুটিয়া গেল কেন। তারপর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘরের ভিতর রোদ পড়িতেই সোমনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন স্ত্রী ও বালক তখনও ঘুমাইতেছে। ট্রেন ছুটিতেছে। বাহিরে চাহিতেই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। দুই ধারে সরিষার ক্ষেত। ধানের বদলে সরিষার হলুদ রং তাঁর মনে এক নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিল। তিনি তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিলেন। ভাবিলেন, একেবারে মুখ ধুইয়া স্ত্রীকে জাগাইবেন। বোধ হয় তিনি বাথরুমে আধঘণ্টাও যান নাই, এমন সময়ে স্ত্রীর চীৎকারে তিনি মুখে জল দিতে দিতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

কি ব্যাপার?

ব্যাপার দেখিয়া তাঁর চক্ষু স্থির। সোমনাথ-গিন্নী কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, খোকাকে এনে দাও।

—খোকা? কেন, খোকা কোথায় গেল?

খোকাকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। তিনি টর্চ ফেলিয়া বেঞ্চির নিচে দেখিবার উপক্রম করিতেই সোমনাথ-গিন্নী জানাইলেন যে, তিনি গাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন, কোথাও পান নাই।

—আচ্ছা, আমি তো আধ ঘণ্টা ছিলাম না। তুমি ঘুম থেকে উঠে কি দেখলে?

—কি আর দেখব। দেখলাম, খোকা পাশে শুয়ে নেই।

—তারপর?

—ভাবলাম, বোধ হয় নিচে গড়িয়ে পড়ে গেছে। ধড়মড়িয়ে চারিদিক্ খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। ওগো, আমার কি হবে?

—তাইতো।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সোমনাথ বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি লক্ষ্য করেছিলে, দুধারে দরজা দুটো বন্ধ ছিল কি না।

—খুব ভাল করে শক্তভাবে আঁটা। খুলতে গিয়ে পারলাম না।

—তাহলে দরজা দিয়ে বাইরে পড়বার সম্ভাবনা নেই।

এক যদি জানালা দিয়ে পড়ে গিয়ে থাকে। জানালা খোলা ছিল।

—তাই বা কি করে হয়? আমার দিকের জানালা বন্ধ ছিল। তোমার দিকেরটা খোলা ছিল বটে, কিন্তু তোমার দিকের জানালা দিয়ে টপকে পড়ে গিয়ে থাকলে তাকে আমার গদি থেকে নেমে তোমার গদিতে উঠতে হবে। ধরে নিলাম না হয়, আমার কাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল, টের পাইনি। কিন্তু তোমার গদিতে উঠল কি করে? অত উঁচুতে উঠবার ক্ষমতা খোকার এখনও হয় নি।

তা বটে। তবে অতটুকুন মানুষটা গেল কোথায়? কি প্রকারে বা গেল? ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তাঁরা তিন জন ছাড়া জনপ্রাণীও ছিল না। বাথরুমের দরজা বন্ধ ছিল। বেশ মনে আছে, সোমনাথ ধাক্কা মারিয়া খুলিয়াছেন। সেখানে নিশ্চয় ঢুকিতে পারে নাই। যদি ঢুকিতেও পারিত, তা হইলে গড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা সেখানে ছিল না। বুঝা যাইতেছে, অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে খোকা অদৃশ্য হইয়াছে। কারণ, সোমনাথ যখন বাথরুমে ঢুকেন তখন মা ও ছেলে ঘুমাইতেছিল। সোমনাথ-গিন্নীর হিসাবমত তিনি মিনিট দশেক ছেলেকে সর্বত্র খুঁজিয়াছেন। সুতরাং মোটামুটি বলা চলে মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যে কেহ বা কারা খোকাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন, কে বা কারা এরূপ করিল ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সোমনাথের পক্ষে অসম্ভব। তিনি এমন কোন শত্রুর কথা স্মরণে আনিতে পারিলেন না যে তাঁর এমন সর্বনাশ করিতে পারে। কি জন্যই বা করিবে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে বা যারা একাজ করুক, কি ভাবে ঘরে ঢুকিয়া খোকাকে চুরি করিল ? বলিতে গেলে, একেবারে মার কোল হইতে ছেলে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। শিশু এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে কি না কে জানে। বাঁচিয়া থাকিলেও না জানি কত কাঁদিতেছে।

তৃতীয় প্রশ্ন, ট্রেনে উঠিবার সময় ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলেন, কেহ নাই। বেগে চলমান ট্রেনে যে বা যারা ঢুকিল, তারা কেমন করিয়া ঢুকিল ?

সোমনাথ অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, গৃহিণীকে কোন প্রকার সান্ত্বনা দিবার কথা তাঁর মনে আসিল না। ইতিমধ্যে ট্রেন একটা ষ্টেশনে আসিয়াছিল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া নামিবার উপক্রম করিতেই দেখেন দুদিককার দরজাই তালাবন্ধ। কি আশ্চর্য ! মৈমনসিংহে কেহ আসিয়া তালা বন্ধ করিয়াছিল বলিয়া তো মনে পড়ে না। তবে কি যারা খোকাকে লইয়া পলাইয়াছে তারা যাইবার সময় দরজা বন্ধ করিয়া পলাইয়াছে। তিনি হাঁকডাক করিয়া লোক ডাকিয়া দরজা খুলাইলেন। তারপর ষ্টেশনের সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া

গেল যে, সোমনাথের ছেলেকে কে বা কারা চলন্ত ট্রেন হইতে চুরি করিয়াছে।

সোমনাথ রেল পুলিশে নালিশ করিয়াছিলেন। দারোগা আসিলেন। বহু সম্মান করিয়া অভিবাদনের পর দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের সঙ্গে চাকর ছিল না?

ছিল তো। রামধন বহু দিনের পুরাতন বিশ্বাসী চাকর। ভোর হইতেই সে অন্য গাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এত গোলমাল, ষ্টেশনশুদ্ধ লোক ব্যস্ত, আর রামধনের দেখা নাই। ইহা বড়ই অস্বাভাবিক। তখন চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। কিন্তু সকল গাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও রামধনকে পাওয়া গেল না।

পুলিশ সবজান্তার হাসি হাসিল।

সোমনাথ বলিলেন, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। রামধন এমন কাজ করবে, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

—কি করেই বা হবে?

—কিন্তু সেই যে নিশ্চয় অপরাধী তার প্রমাণ কি?

—সে পালাল কেন?

তার পলাইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। তারপর আরও একটা কথা তাঁর মনে পড়িল। তিনি যখন ভোরবেলা রামধনকে উঠাইয়া দেন তখন সে প্রায় ছুটিয়া গাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। তাঁর মনে প্রশ্ন

জাগিয়াছিল, সে ছুটিয়া গেল কেন? কিন্তু তখন তো খোকা মায়ের পাশে ঘুমাইতেছিল। সুতরাং সে সময় সে খোকাকে চুরি করিবার অবসর পায় নাই। কখন পাইল? কখন চুপি চুপি আসিয়া লইয়া গেল? চলন্ত ট্রেনে কেমন করিয়া উঠিল ও নিমেষে পলাইল। কি ভয়ানক! যাকে আজীবন বিশ্বাস করিয়াছেন, তার দ্বারা এই কাজ কি কখন হইতে পারে! তবে আর বিশ্বাসের কে রহিল?

পুলিশ যেন তাঁর মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই বলিল, আপনি উকীল। মানুষের চরিত্র ভাল করেই বুঝেন। সুতরাং রামধন হাজার বিশ্বাসী হলেও একাজ করতে পারা অসম্ভব নয়।

কিন্তু সোমনাথ-গৃহিণী মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, রামধনের দ্বারা একাজ কখন হতে পারে না। সে কর্তাকে মানুষ করেছে।

পুলিশ অবিশ্বাসের হাসি হাসিল মাত্র, কথা কহিল না। ভাবখানা এই: মা, তোমরা অন্তঃপুরে লক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিতেছ, বাহিরের জগতের খবর জানিবে কি করিয়া? এখানে ভাই ভায়ের বুকে ছুরি মারিতেছে, ইত্যাদি।

বিশ্বাস না করিয়া সোমনাথের উপায় ছিল না। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল, তার ঠিকানা জানেন?

সোমনাথ ঠিকানা দিলেন। আসলে রামধন জাতিতে

হিন্দুস্থানী, কিন্তু অনেক দিন বাংলা দেশে থাকিয়া বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছে। এখন সে মৈমনসিংহের কোন এক গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল। রামধন খোকাকে লইয়া খুব সম্ভব তার বাড়ি গিয়াছে। সোমনাথ ঢাকায় কয়েকদিন থাকিবেন তো? পুলিশ বমালশুদ্ধ রামধনকে তাঁর নিকট উপস্থিত করিবে, সোমনাথ নিশ্চিত থাকিতে পারেন। মা লক্ষীও খোকাকে ফিরিয়া কোলে পাইবেন। এরূপ বোকা-চোরকে যদি তাঁরা ধরিতে না পারেন, তা হইলে বৃথাই এতকাল পুলিশে চাকরী করিলেন।

পুলিশের কথায় সোমনাথের মন কতকটা হাল্কা হইল। তিনি তখনই হাজার টাকা পুরস্কার কবুল করিলেন। সোমনাথ-গিন্নীও তখনকার মত প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং নিজের গলার হার খুলিয়া সজল চোখে বলিলেন, দারোগা বাবু, আমার ছেলে ফিরে পাই তো, এ হার আপনার।

দারোগার চোখ চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

২। বুদ্ধিমান রামধন

মৈমনসিংহের এক গণ্ডগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে এক কুটির। লোকে দেখাইয়া দিল, রামধন এইখানে থাকে। পুলিশের স্বভাবমত যথেষ্ট লোকজন লইয়া ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পুলিশ সেই কুটির ঘেরাও করিল ভোর

রাত্রে। সেই সময়ে রামধনের স্ত্রী বাইরে পা বাড়াইতে গিয়া দেখে, চারিদিকে লাল পাগড়ি। কাঁপিতে কাঁপিতে সে আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তার কাঁপুনি আর থামিতে চায় না।

রামধন তার নিজ ভাষায় স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁক দিয়া বলিল, কি হল রে ?

যশোমতী কথা কয় না। উপরন্তু তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া মুখে হাত চাপা দিল। কানে কানে অতি সন্তর্পণে বলিল, পুলিশ !

এইবার রামধন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া যাইতেছে। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, কি ? কি ? মিছে কথা।

—না গো না, আমি নিজ চোখে দেখেছি। বলিল যশোমতী পূর্ববৎ কণ্ঠে।

রামধন শুইয়া পড়িতে পড়িতে বলিল, উপায় ?

যশোমতী স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া কতকটা ইতস্তত করিয়া বলিল, তুমি কি করেছ যে পুলিশ তোমায় ধাওয়া করল ?

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

যশোমতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল : সত্যি করে বল, বাবুদের বাড়ি থেকে কিছু চুরি করে এনেছ কি না। মিছামিছি পুলিশ আসবে, এতো মনে হয় না।

রামধন রাগ করিল : কিছু চুরি করে আনলে তো তুই সবার আগে বুঝতে পারতিস।

কিন্তু যশোমতীর ভয় ও অবিশ্বাস গেল না। স্বামী বুড়া হইয়াছে। তবু মানুষের ভীমরতির তো কোন বয়স নাই।

ভোরবেলা কুটিরের দ্বারে করাঘাত হইতে লাগিল।

—কে ?

—দরজা খোল।

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রামধন দরজা খুলিল। অমনই দারোগা বীরোল্লাসে তার দুই হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিলেন।

যশোমতী ঘোমটা টানিয়া পিছনে আসিয়াছিল। সে আগে হইতেই ভয়ে মরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু স্বামীকে হাতকড়া পরাইতে দেখিয়া তার বুকে কোথা হইতে বল আসিল, কে জানে। সে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার স্বামীর অপরাধ ?

—তোর স্বামী! ইঙ্গিতপূর্ণ হাস্য করিলেন দারোগা। বস্তুত, রামধনের সহিত তার স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য অনেক। এমন কি, তাকে রামধনের কন্যা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া চলে।

যশোমতী জোর দিয়া বলিল, হাঁ, আমার স্বামী।

তার মুখের দিকে চাহিয়া দারোগা বুঝিলেন, এটা

সাপের বাচ্চা। বেশি ঘাঁটাইলে ছোবল মারিতে পারে। আগে এর বিষ দাঁত তো ভাঙ্গা যাক, তারপর দেখা যাইবে এত তেজ থাকে কোথায়।

ঘরে একটা বেঞ্চি ছিল। তাতে বসিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দারোগা বলিলেন, ঘরে আর কে কে থাকে ?

রামধন কষ্টে হাত দুটি একত্র করিয়া বলিল, আজ্ঞে আমরা দুজন থাকি, আর কেউ না।

দারোগা ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, দেখ রামধন, যা জিজ্ঞাসা করি, তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও। নইলে ভালো হবে না।

—যে আজ্ঞে।

—তুমি সোমনাথ বাবুকে চেন ?

—আজ্ঞে হাঁ। তিনি আমার মুনিব।

—তাই তাঁর এত বড় অনিষ্টটা তুমি করতে পারলে !

—কি বলছেন আপনি ?

—বলছি ঠিকই। দারোগা ভ্যাঙ্গাইয়া উঠিলেন। যদি ভালো চাস, তাহলে তোর মুনিবের খোকাকে এখনই বের করে দে।

—কি বলছেন আপনি! আমি তাঁকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, আর আমি তাঁর ছেলেকে লুকিয়ে রাখব ?

—হ্যাঁ, তুই লুকিয়ে রেখেছিস।

রামধন এমনভাবে দারোগার দিকে তাকাইল যে, মনে হইল সে এই প্রথম খোকার অন্তর্ধানের কথা জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু দারোগা তার সরলতাকে বিশ্বাস করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, এ বেটা ঘুঘু। সহজে ধরা দিতে চায় না। সুতরাং ইহার সহিত সাবধানে কাজ করিতে হইবে।

দারোগা বাড়ি-তল্লাসির হুকুম দিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, স্থান-অস্থান কিছুই বাকি রহিল না। এমন কি, আশে পাশের দুএকটা ইন্দারাও বাদ গেল না। কিন্তু সোমনাথের পুত্র বা আর কোন ক্ষুদ্র মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হইল না। দারোগার কপালে ঘাম দেখা দিল। তাঁর মনে মনে দৃঢ়-প্রত্যয় ছিল যে, রামধনের গৃহে সোমনাথের পুত্রকে পাওয়া যাইবেই। তাঁর চোখের সামনে সোমনাথ-গিন্নীর হার ও হাজার টাকা জলজল করিতেছিল। হিসাব করিয়া দেখিলেন, রামধনের পক্ষে কোন আত্মীয় বাড়িতে ছেলে লুকাইবার সময় সে যথেষ্ট পাইয়াছিল। তা যে করে নাই, কে বলিল। রামধন ছেলে চুরি করিয়াছে, এ বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ় হইয়া আছে। সে শতবার অস্বীকার করিলেও তিনি তার কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি ধীরে ধীরে

রামধনকে বলিলেন, দেখ রামধন, তোমার ভালোর জন্ম বলছি, তুমি ছেলে বের করে দাও। বড় লোকের ছেলে—টাকা খরচ করতে পিছপাও হবে না। আমরাও—যেমন করে পারি, খুঁজে বের করব। কিন্তু তুমি যদি কথা না শোন, তা হলে মাঝখানে মারা যাবে। এই বলিয়া কি অবস্থায় কোথায় ছেলে হারাইয়াছে, আনুপূর্বিক বলিয়া কহিলেন, বুঝতেই পারছ, তোমার উপর সন্দেহ সহজেই হয়।

সমস্ত শুনিয়া, মনে হইল, রামধন বিচলিত হইয়াছে। সে হাত জোড় করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি নির্দোষ। আমি ছেলে-চুরির কথা কিছুই জানি না। আর আপনি আমায় যে শপথ করতে বলবেন, সেই শপথ করতে রাজি আছি,—আমি ছেলে চুরি করি নি।

তুই যদি ছেলে সত্যিই চুরি করে না এনে থাকিস, তাহলে তুই পালালি কেন? আর ছেলে-হারানর সময় থেকেই তোকে পাওয়া যায় নি। এরই বা অর্থ কি?"

রামধন কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দারোগা বলিলেন, বল্।

রামধন একবার যশোমতীর দিকে চাহিয়া বলিল, হুজুর, জানি না বিশ্বাস করবেন কি না। বাবু যখন আমাকে উঠিয়ে দিয়ে অন্য কামরায় যেতে বল্লেন, ঠিক

সেই সময়ে আমি যেন শুনতে পেলাম যশোমতী কাঁদতে কাঁদতে ডেকে বলছে, আমায় বাঁচাও। আমি স্পষ্ট ওর গলা শুনলাম। শুনে স্থির থাকতে পারলাম না। ভাবলাম ও বুঝি বিপদে পড়েছে। ছুটে অন্ধকারে মিশিয়ে গেলাম।

—বাড়ী এসে কি দেখলি ?

—দেখলাম যশোমতী বেশ ভালই আছে।

—তবে ?

—কে যে এমন কল্লে বুঝতে পারলাম না।

দারোগা প্রচুর হাসিতে লাগিলেন। মনে মনে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তারিফ করিলেন। বেটা এত চালাক যে যুতসই একটা গল্পও তৈরি করিয়া রাখিয়াছে ধোঁকা দিবার জন্য। ভালো। দেখা যাক ইহার বুদ্ধির দৌড় কতদূর।

যশোমতীর দিকে চাহিয়া দারোগা বলিলেন, তুমি যেন আমায় শেষ পর্যন্ত দোষ দিও না। আমি তোমার স্বামীকে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে নিজেই বাঁচতে চায় না, আমি তার কি করব ? তুমি যদি জান, তাহলে বল, ছেলে চুরি করে কোথায় রেখেছে।

ঘোমটার মধ্য হইতে যশোমতী বলিল, আমি জানি না, হুজুর।

—ছেলেকে নিয়ে তোমার এখানে আসেনি ?

—না।

—আর কোথাও তবে লুকিয়ে রেখে এসেছে। বের করে দিতে বল।

যশোমতী নিঃসন্তান। কিন্তু তার বুকে মা হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। ছেলে হারাইয়া মা যে কিরূপ ছটফট করিতেছে, তা ভাবিতে চোখে জল আসিল। যশোমতী ভাবিল, তবে কি স্বামী সত্য সত্যই সোমনাথের—তার মুনিবের, ছেলে চুরি করিয়াছে? ছি, ছি, এ রকম কাজ সে করিতে গেল কেন?

দারোগা যেন যশোমতীর মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, তুমি একবার রামধনকে বিষয়টা বুঝিয়ে দাও। আমরা ও-ধারে দাঁড়াচ্ছি। বলিয়া পুলিশবাহিনীসহ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু হাতকড়া খুলিলেন না।

যশোমতী ফিস ফিস করিয়া বলিল, পরের ছেলেকে ফিরিয়ে দাও না। মা কত কাঁদচে।

রামধন চক্ষু পাকাইয়া বলিল, কি? কি বলছিস্ তুই?

যশোমতী বলিল, রাগ কর কেন? এঁরা ভালো কথাই বলছেন।

রামধন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর দারোগাকে ডাকিয়া বলিল, দারোগা বাবু, বেঁচে আমার সুখ নেই। মুনিব ভাবছেন, আমি তাঁর ছেলে চুরি

করেছি। বউয়ের বিপদের কথা মনে করে দৌড়ে এলাম। সেই বউও বলছে, ভাবতে পারলে, আমি চোর! আমার মরণই মঙ্গল। আপনি আমায় বেঁধে নিয়ে চলুন। শাস্তি দিন।

এদিকে লোক বাড়িতেছিল। দূরে দূরে দাঁড়াইয়া লোকেরা উদ্বিগ্ন ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। লাল পাগড়ির খুব কাছে আসিতে সাহস হইতেছিল না। দারোগা দুচার জনকে ডাকিয়া বলিলেন, এই শোন।

—আজ্ঞে।

—এই রামধনকে তোমরা চেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ও এখানে কত দিন হল এসেছে।

—দিন পনের হবে।

—ওর সঙ্গে আর কেউ ছিল?

—আজ্ঞে না।

—একটি ছোট ছেলে?

—না।

—তোমরা দেখতে ভুল করনি?

—আজ্ঞে না।

গ্রামে এমন লোক একজনও পাওয়া গেল না যে সাক্ষ্য দিল যে, সে রামধনকে ছেলেসহ আসিতে দেখিয়াছে। গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া আর কিছু ষড়যন্ত্র

করিতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, রামধন বেশ চালাক লোক, কাজ গুছাইয়া এখানে আসিয়াছে, এবং নিজেকে বার বার নির্দোষ বলিতেছে। কই, তার নিজের স্ত্রীও তো তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, বলিতেছে ছেলে ফেরত দাও। নিশ্চয় তার ভাব-ভঙ্গীতে যশোমতীর মনেও সন্দেহ জাগিয়াছে।

আর ছেলে হারানর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্ধান সম্বন্ধে গল্পটা শুধু বেকুবেই বিশ্বাস করিতে পারে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে দারোগা রিপোর্ট লিখিলেন, এবং রামধনকে চালান দিলেন।

৩। মহিমময়ী নারী

সোমনাথ-গৃহিণী ছেলের শোক ভুলিতে পারেন নাই। ভোলা কি সহজ? প্রতি কাজে সেই কুসুম-পেলব নধর শিশুকে মনে পড়ে। তাঁর খালি বুকের আর্তনাদ কিছুতেই থামিতে চায় না। ঢাকায় এবার সোমনাথ বাবুর মন বিকল হইয়া ছিল। টাকা পাইলেন প্রচুর। তথাপি মন উঠিল না। টাকা ও ঢাকাই শাড়ী আনিয়া স্ত্রীকে উপহার দিলেন। কিন্তু স্ত্রীর মুখে ম্লান হাসি ফুটিলমাত্র। খোকার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই উভয়ের মধ্যে হয় না, পাছে একের কথায় অন্যের দুঃখ বাড়ে। তথাপি সমভাবে উভয়ের অন্তর পুড়িতে থাকে।

ঢাকার পাট উঠাইবার সময় আসিয়াছে। একদিন বিকালে সোমনাথ ও তাঁর স্ত্রী চা-পানের পর বসিয়া আছেন, এমন সময় বাহিরের দিকে একটা কোলাহল উঠিল।

সোমনাথ-গিন্নী বলিলেন, দেখ তো কি। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বাহিরে আসিলেন।

সোমনাথ বাহিরে আসিয়া দেখেন, তাঁর পূর্ব-পরিচিত দারোগা সাহেব, সঙ্গে জনা চারেক কনষ্টবল। আর হাতকড়া লাগান অবস্থায় রামধন। তার বস্ত্র ধূলিধূসরিত, চুল রুক্ষ, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চক্ষু লাল। দারোগা সমীহ দেখাইয়া নমস্কার করিতেই কনষ্টবলরা স্যালুট করিল।

সোমনাথ দারোগাকে বসিতে বলিলেন।

সোমনাথের কাঁধের পিছন হইতে সোমনাথ-গৃহিণী উঁকি দিতেছিলেন। রামধনের চেহারা দেখিয়া মায়া করিতে লাগিল।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর, দারোগা বাবু।

—চোর ধরে এনেছি।

স্বামী-স্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন: চোর? রামধন কি ছেলে চুরি করেছে?

দারোগা একবার গোঁফে চাড়া দিয়া লইলেন। বোধ হয় আত্ম-প্রত্যয়কে দৃঢ় করিবার জন্য। বলিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সোমনাথ সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন। পাশে তাঁর স্ত্রীও বসিলেন। অস্ফুট স্বরে বলিলেন, আমার ছেলে কই ?

—মা লক্ষ্মী, আমি যখন কাজ হাতে নিয়েছি, তখন ছেলে ফিরে পাবেনই। ভেবেছিলাম, ঢাকা থাকতে থাকতে আপনার ছেলে আপনার হাতে এনে দেব। তা হল না। এ বেটাকে যত চালাক ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি চালাক। ছেলে নিয়ে গাঁয়ে যায় নি। অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে। যেখানেই লুকোক, আমরা খুঁজে বের করব।

সোমনাথ উকীল মানুষ। তাঁর মধ্যেকার উকীলটা দারোগার কথা সহজে মানিয়া লইতে চাহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি করে জানলেন, রামধন ছেলে চুরি করেছে ?

—বাঃ, ওর স্ত্রী পর্যন্ত ওকে সন্দেহ করছে যে। দারোগার মুখে বিজ্ঞের হাসি।

—কিন্তু সেটা কোন প্রমাণ নয়। স্ত্রী সন্দেহ করছে কি না জানি না—

—ওর স্ত্রী ওকে বার বার করে বলেছে, ছেলে ফিরিয়ে দাও। কি রে রামধন, বলে নি ?

রামধন কাতর ভাবে বলিল, আজ্ঞে হাঁ, হুজুর, বলেছে ?

—তবে ?

—তবু আমি এটা প্রমাণ বলে মেনে নিতে পারি না। জেদ করিয়া বলিলেন সোমনাথ। তাছাড়া আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি জানেন দারোগা বাবু, আপনার ছেঁদো কথা হাকিম শুনবেন না। মাঝ থেকে আমার ছেলেকেও পাওয়া যাবে না। কাউকে দোষী বলবার আগে, তার দোষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হবে তো।

মনে হইল, রামধন খুব মনোযোগ দিয়া সোমনাথের কথাগুলি শুনিতেছিল। দারোগা প্রমাদ গণিলেন। পুত্র হারাইয়াও পিতার বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে বিরল। অথচ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, ভুল করেন নাই, এই সময়ে সোমনাথ-গিন্নীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

দারোগা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আপনি তবে কাকে সন্দেহ করেন ?

—রামধনের রকম-সকম সন্দেহজনক বটে। কিন্তু প্রমাণ কৈ ? কাজেই আমি বলতে পারি না সে নির্দোষ। কিন্তু দোষী, একথাও তো বলতে পারি না।

—তাহলে আমায় কি করতে বলেন ?

—আপনাকে পরামর্শ দিবার দায় তো আমার নয়। আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন।

দারোগা কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করিলেন। তারপর

ধীরে ধীরে বলিলেন, উকীল বাবু, আপনার মত লোককে আমার কোন কথা বুঝাতে যাওয়া পাগলামি মাত্র। সে আমি বুঝি। কিন্তু চোর-ডাকাত ধরবার জন্য আমরা সব সময় ঠিক আইনের বাঁধা পথে চলি না। আর অভিজ্ঞতার বলে জানি, তাতে যত সহজে দোষী ধরা পড়ে, প্রত্যেক আইন বাঁচাতে গেলে তত সহজে পড়ে না। আমি ভেবেছিলাম, আপনাদের ছেলেকে রামধনের বাড়িতে পাওয়া যাবে, আর আমি সহজেই খোকাকে আপনাদের কোলে এনে দিতে পারব। কিন্তু ও যে এত চালাক, আমি ভাবতে পারি নি। কোথায় ছেলে লুকিয়ে রেখেছে, সেটা আমাদের খোঁজ করতে হবে। আমি শুধু চাই, আমার কাজ আপনাদের পছন্দ না হলেও বাধা দেবেন না।

—আপনি কি করতে চান, বলুন। আপনি যা ভাল বুঝবেন, তাতে বাধা দেওয়া আমার তো ঠিক হবে না। আপনার কাজের দায়িত্ব আপনারই থাকবে।

—আপাতত, আমাকে চেষ্টা করে দেখতে হবে, রামধন তার অপরাধ স্বীকার করে কি না। সহজে না করলে তখন ওষুধ লাগাতে হবে। বলিয়া হাসিলেন।

সোমনাথ রামধনের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রামধন, সত্য কথা বল্। তুই কি ছেলে চুরি করেছিস্?

—না।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক জবাব দে। সেদিন রাত্রে মৈমনসিংহে তোকে যখন ঘুম থেকে উঠিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে বল্লাম, তুই ও রকম দৌড়ে চলে গেলি কেন?

রামধন পূর্বে দারোগাকে যা বলিয়াছিল, সোমনাথকেও তাই বলিল। সোমনাথ বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, তুই নিজের গাড়িতে না উঠে পালিয়ে গেলি কেন?

—আমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি হয়েছিল।

—তুই ছেলে চুরির কথা কিছু জানিস্ না?

—আজ্ঞে না।

—তুই যখন উঠে যাস, খোকাকে দেখেছিলি?

—আজ্ঞে হাঁ।

—কি ভাবে দেখেছিলি।

—কম্বল চাপা ছিল।

—খোকার মুখ দেখেছিলি?

—না।

—তবে কি করে জানলি, কম্বল চাপা ছিল। এমন তো হতে পারে, খোকাকে অনেক আগেই কেউ সরিয়েছিল, আর তারপর এমন ভাবে কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছিল যে দেখলে মনে হবে, খোকা ভেতরে ঘুমিয়ে আছে। আমরা তো সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুমের মধ্যে কিছুই বুঝতে পারি নি।

সোমনাথ ইচ্ছা করিয়া কথা চাপিয়া গেলেন। কারণ, তাঁর বেশ স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর কামরার দুদিকের দরজা বন্ধ ছিল। ষ্টেশনে ডাকাডাকি করিয়া দরজা খুলাইয়াছিলেন। দারোগা তো অত কথা জানেন না। উকীল বাবুর জেরা দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। তাঁর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। বেচারা রামধন কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল, হাঁ, তাও হতে পারে।

—কি হতে পারে ?

—গাড়ি থেকে আমি নেমে যাবার আগে খোকাকে কেউ চুরি করে নিয়ে আবার কম্বল আগের মত করে রাখতে পারে।

—তবে ? বলিলেন দারোগা।

রামধন দারোগার দিকে তাকাইয়া বলিল, হুজুর যদি তা মনে করেন, তাহলে আমায় ছেড়ে দিন। মুনিবের কথা সত্য হলে আমি নির্দোষ, প্রমাণ হল। আমি গাড়ি থেকে নামবার আগে খোকাকে কেউ নিয়ে গিয়ে থাকলে, আমাকে কেন দোষী মনে করেন ?

দারোগা চমৎকৃত হইলেন। বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে থাকিয়া থাকিয়া বেটার ক্ষুরধার বুদ্ধি হইয়াছে। দুঃখের মধ্যেও সোমনাথ হাসিতে লাগিলেন।

রামধনকে লইয়া দারোগা বিদায় হইবেন, নমস্কার করিয়া মাত্র উঠিয়াছেন, এমন সময় সোমনাথ-গিন্নী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দারোগার সামনে আসিলেন। একটু দাঁড়ান, তিনি বলিলেন।

দারোগা থমকিয়া গেলেন, কিছু বলবেন ?

সোমনাথ-গিন্নী তাঁর কথার উত্তর না দিয়া পূর্ণ-দৃষ্টিতে রামধনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, রামধন !

—মা, রামধনের মাথা আপনা হইতে নত হইয়া গেল।

—আমার দিকে তাকাও রামধন। যেখান থেকে পার আমার ছেলে এনে দাও। সোমনাথ-গিন্নীর দুই চোখ ভরা জল টলটল করিতেছে।

রামধন থাকিতে পারিল না, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল : মারে, সাধ্য থাকলে আমি খোকাকে খুঁজে আনতাম। আমি যে এখন পুলিশের হাতে, আমায় ছাড়বে না। বাবুকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। সেই বাবুর ছেলেকে আমি চুরি করব, একথা আর যেই বিশ্বাস করুক, তুমি বল মা, তুমি বিশ্বাস কর নি। আমার কথা বউ বিশ্বাস করে না, পাড়ার লোকেও বলে, আমি চোর। পুলিশ তো বেঁধে এনেছে। শুধু তুমি বল মা, তুমি বিশ্বাস করনি।

—না, বিশ্বাস করি নি।

রামধনের বুক হইতে একটা গভীর নিঃশ্বাস বাহির

হইল, কিন্তু তার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন সে পরম তৃপ্তি পাইয়াছে। তখন প্রভুপত্নী ও ভৃত্যের চোখের জল সেখানে স্বর্গ রচনা করিয়াছে। রামধন বলিল, মা তোমার দুঃখ কি আমার দুঃখ নয়? তোমার দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

দারোগার মনে হইল, ইহারা আমাকে গ্রাহ্য করিতেছে না। পরন্তু বাড়াবাড়ি করিতেছে। চোখের জল দিয়া কি আইনের রথচক্রকে থামান যায়? কঠিন কর্ত্তব্যের নিকট ভাব-বিলাসিতার কোন মূল্য নাই।

এতক্ষণে সোমনাথ-গিন্নীর দারোগার দিকে তাকাইবার অবকাশ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, দারোগা বাবু, রামধনকে নিয়ে কি করবেন?

—বিচারের জন্য চালান দিব।

—তারপর?

—হাকিমের কাছে বিচার হবে। দোষী প্রমাণ হলে শাস্তি পাবে, আর নির্দোষ প্রমাণ হলে খালাস পাবে।

—ওর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাবে কে?

দারোগা মনে মনে বলিলেন, উকীলের স্ত্রী কি না, তাই উকীলের সঙ্গে থেকে উকীলের মত জেরা শিখেছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, চেষ্টা করব যাতে সরকার মোকদ্দমা চালান।

—যদি না চালান?

—তা হলে আপনাদের চালাতে হবে।

—যদি আমরা না চালাই।

—তা হলে ওকে ছেড়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দারোগা আবার বলিলেন, ছেলে হারিয়েছে আপনাদের। আপনারা যদি ছেলের কিনারা না করতে চান, অপরাধীকে ধরতে না চান, তা হলে আমার কি বলুন। নালিশ না হলে, আমি তো কোন ব্যবস্থা করতে পারি না। কতকগুলি ঘটনার যোগাযোগে রামধনকে সন্দেহ হয়েছিল, তাই ধরে নিয়ে এসেছি।

—দারোগা বাবু, আপনার কষ্টের জন্য ধন্যবাদ। আপনি রাগ করবেন না। রামধনকে ছেড়ে দিব।

—কেন ?

—ও নির্দোষ।

—কিসে বুঝলেন ?

—আমার মন বলছে।

দারোগা হাসিয়া উঠিলেন: কোন লোক দোষী কি না, তা ঠিক করবার উপায়, মা, আলাদা। আপনার ছেলেকে আবার আপনার কোলে এনে দিব। কিন্তু দোহাই আপনাদের, রামধনকে ছেড়ে দিতে বলবেন না। রামধন থেকেই অপরাধের সূত্র পাওয়া যাবে।

সোমনাথ উকীল। তিনি স্ত্রীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার মানসে বলিলেন, রামধনকে তুমি নির্দোষ মনে কর,

ভালো কথা। কিন্তু দারোগা বাবুর কাজে তুমি বাধা দিতে যাচ্ছ কেন? তিনি যা ভালো মনে করবেন, তাঁকে তাই করতে দাও। তিনি যা করতে যাচ্ছেন, তা তো আমাদের ভালোর জন্য।

—পরের অনিষ্ট করে নিজের ভালো করতে চাই না।

দারোগা বলিলেন, আপনাকে কথা দিচ্ছি, যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি একটুও খারাপ ব্যবহার ওর সঙ্গে আমরা করব না। কিন্তু ওকে ছেড়ে দিলে আমার সব চেষ্টা পণ্ড হবে।

সোমনাথ-গিন্নী স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, একটা কথা সত্য বলবে?

—কি?

—তুমি কি সত্যি মনে কর রামধন আমাদের ছেলেকে চুরি করেছে?

সোমনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। কি উত্তর তিনি দিবেন? রামধন দোষী, তিনি একথা বলিতে পারেন না। নির্দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্তই বা তিনি কি করিয়া বলিবেন, সে নির্দোষ?

স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সোমনাথ-গিন্নী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, আমি জানি ও নির্দোষ। দারোগা বাবু ওকে ছেড়ে দিন।

সোমনাথের দিকে চাহিয়া দারোগা বলিলেন, সেটা কি ভালো হবে ?

তখন সোমনাথ-গিন্নী গ্রীবা উন্নত করিয়া অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া বলিলেন, আমি জানি, রামধন নির্দোষ। নির্দোষ লোককে শাস্তি দিলে আমার ছেলের বা আমার স্বামীর কল্যাণ হবে না। আর শুনুন দারোগা বাবু, ও যদি দোষী হত, আমার ছেলে চুরি করত, তাহলেও ওকে ছেড়ে দিতে বলতাম। অদৃষ্টে থাকলে, ছেলে আমি ফিরে পাব।

দারোগা কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু ছেলে এনে দিলে পুরস্কারের কথা আপনারাই বলেছিলেন।

—হাঁ, বলেছিলাম। হাজার টাকা আর হার আপনি পাবেনই, ছেলে যদি ফিরে পাই। আর আপনি যে এত কষ্ট করেছেন, তার জন্য এই নিন। আঁচল খুলিয়া সোমনাথ-গিন্নী দারোগাকে এক শ টাকার একটি নোট দিলেন।

দারোগা দলবল লইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন।

মুক্ত রামধন কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকিল, তারপর সেই ভূমির উপর সোমনাথ ও তাঁর স্ত্রীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল।

কাজটা যে সোমনাথের খুব মনঃপূত হইল, তা বলিতে পারি না। তথাপি নিজের অজ্ঞাতসারে পুরাতন ভৃত্য মুক্ত হওয়ায় কতকটা খুসি হইয়াছিলেন।

সোমনাথ বলিলেন, সব তো বুঝলাম। কিন্তু ছেলে খুঁজবে কে?

—কেন, দারোগা।

—এই অপমানের পর আর খুঁজবে না।

—অপমান কিসের। হাজার টাকা ও হার কবুল করা আছে।

—তা বটে।

রামধন বলিল, মাঠাকরুণ আমি খুঁজব।

তার কথাকে সোমনাথ বা তাঁর স্ত্রী আমোল দিলেন না। রামধন আবার আগের মত রহিয়া গেল।

৪ : কৃষ্ণবর্ণ খামের চিঠি

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সোমনাথ দেখিলেন, তাঁর টেবিলের উপর অনেকগুলি চিঠি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। কয়েক দিন কলিকাতায় ছিলেন না, সেইজন্য এগুলো জমিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, অবসর কালে একে একে পড়িয়া দেখিবেন। এখন সময় নাই। তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া আদালত যাইতে হইবে। সেখানেও অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছে। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটা বিশেষ ধরণের খাম তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। খামটা ঘোর কাল রঙের, আর তার উপর সাদা কাগজে টাইপ করা তাঁর নাম ও

ঠিকানা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই লোকের কৌতূহল হয়। তাঁরও হইল। এই অদ্ভুত থামে কে তাঁকে চিঠি লিখিল? পূর্বে কেহ তাঁকে এ ভাবে লিখিয়াছে, তাতো মনে পড়ে না। তিনি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অমনই প্রথমে তাঁর নজরে পড়িল, ফিকে গোলাপী রঙের চিঠির কাগজ, তাতে গন্ধ মাখান, তার বাম কোণে উর্ধ্বে একটি খড়্গ আঁকা। চিঠি আগাগোড়া ইংরেজিতে টাইপ করা। উপরে ঠিকানা নাই। নিচে নাম নাই। চিঠির উপর চোখ বুলাইবা মাত্র তিনি ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেছে। ঠোঁট কাঁপিতেছে। দুই চোখে ভয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি পত্রটিতে আবার মনঃসংযোগ করিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিলেন। তবু যেন পত্রের মর্ম হৃদয়ংগম করিতে পারিলেন না।

সোমনাথ ঘণ্টা টিপিলেন। বেয়ারা আসিতেই সংক্ষেপে বলিলেন, মাজি।

—জি।

সোমনাথ-গিন্নী আসিলে সোমনাথ চিঠিটা তাঁর দিকে ঠেলিয়া দিলেন, দেখ।

সোমনাথ-গিন্নী ধীরভাবে চিঠিটা আগাগোড়া পড়িয়া ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁকে তেমন বিচলিত দেখা গেল না। ইংরেজি চিঠির মর্ম নিম্নরূপ :

—প্রিয় মহাশয়, আপনার সহিত আমাদের পরিচয় নাই। কিন্তু আপনার শিশু-পুত্রের সহিত সম্প্রতি হইয়াছে। ছেলেটির প্রতি আমাদের মায়া বসিয়া গিয়াছে। যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমন স্বভাবে সুন্দর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, যতদিন আমাদের কাছে থাকিবে, তত দিন তার গায়ে আঁচড়ও লাগিবে না। সে বেশ ভালো আছে ও মনের আনন্দে আছে। শিশুদের কি ভাবে রাখিতে হয়, তা আমরা জানি। আমাদের প্রতিষ্ঠান একটি লোকহিতকর ব্যাপার। কিন্তু টাকা সহজে যোগাড় হয় না। সেজন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। আপনার সম্পর্কে একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছি, সেজন্য পূর্বাহ্ণে মাপ চাই। আপনার আয়ের খবর আমরা রাখি। সেজন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমাদের সমিতিকে দশ হাজার টাকা দান করুন। যে মুহূর্তে আপনার কাছে টাকা পাইব, সেই মুহূর্তে আপনার স্ত্রী তাঁর ছেলেকে কোলে পাইবেন। ভাবিয়া দেখুন, টাকার চেয়ে আপনার খোকার দাম অনেক বেশি। আপনি যদি খোকাকে হারাইতে না চান, তা হইলে আজ হইতে পনের দিনের মধ্যে টাকাটা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। অমুক নং রাস্তার ১৩নং বাড়ি। একটা পড়ো বাড়ি। সেই বাড়ির দোতলার বারান্দায় (পূব দিকে) একটা সিন্দুক আছে। তাতে তালা লাগান আছে বটে,

কিন্তু টানিলেই খুলিবে। ঐ সিন্দুক খালি। তাতে দশ হাজার টাকা রাখিয়া দিবেন। চেক দিবেন না। নোটও দিবেন না। সমস্ত কাঁচা টাকা চাই। ঐ বাড়িতে একা ঢুকিবেন, সঙ্গে কাকেও লইবেন না। আপনি কথা রাখিলে আপনার কোন বিপদ হইবে না। আপনি ঐখানে টাকা রাখিয়া বাড়িতে পৌছিবার পূর্বে আপনার ছেলে বাড়ি পৌছিবে। এ বিষয়ে কোন ভুল নাই। পুলিশের কোনপ্রকার সাহায্য লইবেন না। তাতে আপনার অনিষ্ট হইবে। আমাদের সহিত কোনপ্রকার চালাকি করিতে গেলেই আপনি মারা পড়িবেন, একথা আপনাকে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। আপনি যত বড় উকীল হোন, পুলিশের যত সহায়তা নিন, আমাদের সঙ্গে পারিবেন না। অযথা নরহত্যা বা লোকের অনিষ্ট আমাদের অভিপ্রায় নয়। কিন্তু দরকার হইলে আমরা কোন কাজেই পিছপাও নই। যদি আপনি পনের দিনের মধ্যে উল্লিখিত টাকা আমাদের না দেন, তা হইলে ছেলে ফিরিয়া পাইবেন না। এবং আরও কি শাস্তি আপনাকে দেওয়া যায়, বিবেচনা করিয়া দেখিব। খোকার মায়ের কান্নায় আমরা অত্যন্ত বিচলিত ও দুঃখিত, কিন্তু উপায় নাই। আপনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। আশা করি, আপনাকে পুনরায় পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইবে না। ইতি খড়্গধারী।

সোমনাথ বলিলেন, উপায় কি হবে?

—কিসের উপায়! সোমনাথ-গিন্নীর মুখ হইতে বহু দিনের উদ্বেগের ছায়া অপসারিত হইয়াছে। তাঁর ছেলে ভালো আছে, সুখে আছে, এই খবরটুকু তাঁর বুক হইতে যেন পাষাণভার তুলিয়া লইয়াছে।

সোমনাথের অবস্থা ঠিক উল্টা রকমের। একটা সংঘবদ্ধ বুদ্ধিমান ডাকাতের দলের হাতে ছেলে পড়িয়াছে, এই সংবাদ তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছে। তারা আবার শাসাইয়াছে, তিনি পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিলে তাঁর বিপদ হইবে, এমন কি হয়তো চিরদিনের জন্য ছেলে হারাইতে পারেন। এই সব কথা কি সোমনাথ-গিন্নীর মনে উদয় হয় নাই? তিনি তাঁর মুখের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।—ছেলেকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করব কি করে ভেবে পাচ্ছি না। বলিলেন সোমনাথ।

—তার আর কি। ওরাই তো কাজটা সহজ করে দিয়েছে।

—দশ হাজার টাকা চেয়ে?

—হাঁ।

—তুমি কি ওদের কথা বিশ্বাস কর? যারা এমন কৌশলে চলন্ত ট্রেন থেকে ছেলে চুরি করতে পারে,

সকলের চোখে ধূলো দিয়ে উধাও হতে পারে, তাদের অসাধ্য কি কাজ আছে?

—ওরা তো বলেছে, পরের উপকারের জন্য টাকা চায়।

—ক্ষেপেছ। ওরা শুধু নিজের স্বার্থ বোঝে। সৎকাজ যদি ওদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে উপায়টা এত অসৎ কেন?

—তাতো জানি না। ওদের কোন কথাই জানি না। তুমি তো এতকাল ওকালতি করছ, খড়্গধারীদের সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমার কথা তোমার জানা আছে কি? শুনেছ?

—না।

—তাহলে এটা তো বলা যায় যে, তারা এ পর্যন্ত কোন মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে নি, অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কোন নালিশ নাই, তারা অপরাধী দল নয়।

—পুলিশে মোকদ্দমা করলে অপরাধী হয়, আর না করলে অপরাধী হয় না, এমন কথা আমাদের শাস্ত্রে লেখে না।

—তা যেন হল, এখন কি করবে ঠিক করেছ?

—তুমি কি বল।

—দশ হাজার টাকা দিয়ে দাও। যেমন যেমনটি লিখেছে ঠিক সেই ভাবে দিয়ে দাও। খোকাকে আমি কোলে ফিরে পাই।

—তাতে কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না? আজ আমার ঘাড় ভাঙছে, কাল আর একজনের ভাঙবে।

—সে বিচারের ভার তোমার আমার নয়। ওরা অন্যায় করে, তার শাস্তি পাবে। কিন্তু আমরা বিচার করবার কে?

—ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের যন্ত্র তো আমরা হতে পারি। পড়নি, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—

—পড়েছি। কিন্তু এখানে খাটাতে পারছি না।

—কেন?

—প্রথমত, ওরা অন্যায় করবে কি না জানি না। দ্বিতীয়ত—

—প্রথমত, দ্বিতীয়ত রেখে দাও। তোমার কথা হল তুমি ছেলে কোলে ফিরে পেতে চাও।

—হাঁ।

—ঐ যে ওরা চিঠিতে লিখেছে তোমার ছেলে ভালো আছে, আনন্দে আছে—

—থাক্। তবু আমার বাছা আমার কোলে না থাকলে আরাম পাব কেন? মায়ের প্রাণ তো।

—আচ্ছা, আমায় একটু ভাবতে সময় দাও। একটু পরামর্শ করি। দুচার জনের মতামত নিই।

—না, না, তুমি অমন কাজটি করবে না। বলিলেন সোমনাথ-গিন্নী শঙ্কিত চিত্তে।

—কেন ?

—দেখনি, ওরা লিখেছে, তুমি কারও সাহায্য নেবে না—

—তুমি দেখছি ওদের প্রত্যেক কথা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করে বসে আছ। ভয় নেই, আমি এমন কিছু করব না, যাতে আমরা বিপদে পড়তে পারি।

—কিন্তু একটা কথা।

—কি ?

—রামধনের উপর থেকে তোমার সব সন্দেহ গেছে তো ?

—হাঁ।

সোমনাথ খাওয়াদাওয়া সারিয়া আদালতে চলিয়া গেলেন। পকেটে সেই কালো খামের চিঠিটা রহিল।

মধ্যাহ্নের কাজ শেষ করিয়া আহারাদির পর সোমনাথ-গিন্নী তাঁর শোবার ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিদিন এই সময় একটু নিদ্রা যাওয়া তাঁর অভ্যাস। ছেলেকে হারান অবধি তাঁর নিদ্রা হয় না। নানা চিন্তা তাঁর মগজকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে। আজ নূতন চিন্তা দেখা দিয়াছে। আজ দুই মাস হইতে চলিল, খোকাকে হারাইয়াছেন। এতদিনে কি বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন ? তাঁর কোলের বাছাকে তিনি কোলে ফিরিয়া পাইবেন ? আশায়-আশঙ্কায় তাঁর বুক দুরু দুরু

করিয়া উঠে। খোকা ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিলে তিনি কালিঘাটে মা কালীকে জোড়া পাঁঠা দিবেন। ওরা লিখিয়াছে, ছেলে ভালো আছে। আরও লিখিয়াছে, আনন্দে আছে। তাই কি? মাকে ছাড়িয়া খোকা কখনও আনন্দে থাকিতে পারে? কি রকম খট্‌কা লাগে। আনন্দে সে থাকিতে পারে না সুতরাং ভালো থাকার কথাটা যে মিথ্যা নয়, তাই বা কে বলিল? খোকা যে প্রাণে বাঁচিয়া আছে, এজন্য ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ। তাকে উদ্ধার করিবার জন্য দশ হাজার টাকা লাগিবে! তা লাগুক। ঈশ্বরের কৃপায় সোমনাথের টাকার অভাব নাই। খোকার চেয়ে আর টাকা কিছু বড় জিনিষ নয়। খোকা! খোকা! খোকা! মাতৃস্তন্য টন টন করিয়া উঠে।

বোধ হয়, সোমনাথ-গিন্নীর তন্দ্রা আসিয়াছিল। এমন সময় বাইরে কড়ানাড়ার শব্দে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ডাকিয়া বলিলেন, রামধন!

—মা ঠাকরুণ।

—দেখতো কে?

-আজ্ঞে।

ফিরিয়া আসা অবধি ভৃত্য রামধন অনুক্ষণ তার মনিব ও মনিব-পত্নীকে চোখে চোখে রাখে। বৃদ্ধ হইলে কি

হইবে ? সে জোয়ান বয়সের কর্মশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। ছুটিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, তার-পিয়ন।

রামধন জিজ্ঞাসা করিল, কি চাও ?

—তার আছে।

—দাও।

তাড়াতাড়ি তার লইয়া সোমনাথ-গিন্নীর কাছে গেল। তিনি সহি করিয়া খাম ছিঁড়িলেন। ততক্ষণে সহির কাগজখানা রামধন পিয়নকে ফিরাইয়া দিতে গিয়াছে। তারের খবর পড়িয়া সোমনাথ-গিন্নীর চক্ষুস্থির। লেখা—তোমার বাবা অত্যন্ত পীড়িত। শীঘ্র এস। তরুণ। কি পীড়া, কি বৃত্তান্ত কিছুই লেখা নাই।

সোমনাথ-গিন্নী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বিপদ কখন একা আসে না, তার পরিচয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। আরও কি বিপদ হইবে কে জানে। কি কুক্ষণে তিনি এবার স্বামীর সঙ্গে ঢাকা গিয়াছিলেন। অনবরত বিপদ আসিতেছে। এখন কি করা কর্তব্য ? তিনি তাঁর বাপের মা-মরা একমাত্র দুহিতা। তিনিও বাবা-অন্ত প্রাণ। বড় হইয়াছেন, ছেলের-মা, তবু বৎসরে অন্তত একবার পিতৃ-সন্দর্শনে যাওয়া চাই। তাঁর মন তখনই পীড়িত পিতার শয্যাপার্শ্বে চলিয়া গেল। না জানি বাবা তাঁকে একবার দেখিবার জন্য কত ছটফট করিতেছেন। 'অত্যন্ত' শব্দটির অর্থ কি ? বাঁচিবেন তো ? গিয়া দেখিতে পাইবেন তো ?

না, মৃত্যুর পর তার করিয়াছে? তরুণ তাঁর দূরসম্পর্কের ভাই। সে কি তাঁকে মিথ্যা লিখিবে? পাছে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন, সেজন্য কি সে আসল খবর চাপিয়া গিয়াছে? এরূপ অবস্থায় যেমন হয়, তাঁর মন অত্যন্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি কি করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। অসহ্য উদ্বেগের মধ্যে পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলেন সোমনাথের জন্য।

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া রামধনের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, মা, কিরে?

সোমনাথ-গিন্নী সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, এবং তাঁর মনে যে কি উদ্বেগ হইতেছে প্রতিমুহূর্তে, তাও জানাইলেন।

রামধন কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া চিন্তা করিয়া বলিল, মা, কোন ভয় নাই, তোমার বাবা ভাল হয়ে যাবেন।

—যাঃ।

—সত্যি বলছি, মা।

অনেক সময় সামান্য লোকের সান্নিধ্য ও দুটা সান্ত্বনার কথারও প্রয়োজন থাকে। রামধন যেন অসহায়ের অবলম্বন হইল। তিনি তার সঙ্গে বাপের বাড়ির গল্প করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হয়-হয়।

ঘরে ঘরে বাতি জ্বলিল। শাঁখ বাজিল। অন্য দিন বহু পূর্বে সোমনাথ আদালত হইতে ফিরিয়া আসেন।

দেরী হইলে, বলিয়া যান—দেরী হইবে। আজতো কিছু বলেন নাই। তবে সোমনাথ এখনও ফিরিলেন না কেন? যেদিন বেশি দরকার সেদিনই দেরী করিতেছেন! আশ্চর্য!

নূতন উদ্বেগ ও আশঙ্কা তাঁর চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রামধনের কোন বাক্যই তাঁকে সান্ত্বনা দেয় না। তিনি মনে মনে অনবরত ইষ্ট-দেবতার নাম জপ করিতে লাগিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, স্বামী, পুত্র ও পিতার কল্যাণ হোক। এমন কি, তাঁদের কুশলতার জন্য তাঁর নিজের বিনাশও তিনি বাঞ্ছা করিলেন। হে বাঞ্ছাপূর্ণ হরি, আমার কথা শোন। এই উদ্বেগ ও ভয় থেকে আমায় রক্ষা কর। স্বামী-পুত্র ফিরাইয়া দাও। বাবাকে সুস্থ কর।

৫। শ্রী ভদ্র

ওদিকে একটা সঙ্গীন মোকদ্দমায় জেরা করিতে করিতে আদালত কক্ষে অকস্মাৎ সোমনাথের চোখের সামনে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কয়েকটি কথা ভাসিয়া উঠিল। কেন যে উঠিল, তা তিনি নিজেও বলিতে পারেন না। স্মৃতির কোন তলায় ছিল, কে জানে, কিন্তু আজ অসময়ে তাঁর মনে হইল, ঢাকা যাইবার আগে তিনি একদিন আনন্দ-বাজার পত্রিকায় শ্রী ভদ্র স্বাক্ষরিত এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন

দেখিয়াছিলেন। ঠিক তো। আজ শ্রী ভদ্রের সহিত দেখা করিয়া পরামর্শ চাওয়া যাইতে পারে। ভদ্র সব কথা গোপন রাখিবেন, সন্দেহ নাই। অবশ্য তাঁর ছেলে-চুরির কথা আদালতে কারও অবিদিত ছিল না। এজন্য সারাদিন তাঁকে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত থাকিতেও হইয়াছে। সহানুভূতি প্রকাশও তাঁকে কম উত্যক্ত করে নাই। কিন্তু কিন্তু মনে হয়, শ্রী ভদ্র ঠিক পরামর্শ দিতে পারিবেন।

যাই হোক্, আদালতের কাজ সারিয়া বিকালের দিকে তিনি বর্মণ ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকার আফিসে গেলেন। নম্বরটা মনে ছিল—৭২৩। একবার মনে হইল, বাড়ি গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসেন। দেরী কত হইবে জানা নাই, স্ত্রী ভাবিত হইবেন। আবার ভাবিলেন, কাজ সারিয়া বাড়ি ফেরাই ভালো। একটু দেরী হইলে আর এমন কি ক্ষতি হইবে?

৭২৩ নং বাক্সের খোঁজ করিতেই এক সুদর্শন যুবকের সহিত দেখা হইল। যুবক বলিল, আমিই ৭২৩ নং।

—তার মানে? সোমনাথ আশ্চর্য হইয়া তাঁর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁর মনে পড়িল বিজ্ঞাপনে ছিল ৭২৩ নং বাক্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা।

—৭২৩ নং বাক্সের পরিবর্তে আমিই বাক্সের কাজ করি। যুবকটি হাসিল না, কিন্তু মনে হইল সে হাসিতেছে।

—আমি একবার শ্রীযুক্ত ভদ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—চলুন।

ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। তার কাথাবার্তাও সুন্দর। সে বাহিরে আসিয়া পকেট হইতে একটা বাঁশী বাহির করিয়া ফুঁ দিল। দেখা গেল, তখনই একটা লোক কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিতেছে। উর্দি-পরা। সে আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল। তার কানে কানে যুবক কি বলিয়া দিল, সোমনাথ বুঝিতে পারিলেন না। লোকটা দৌড়াইয়া গিয়া একটা বদ্ধ মোটর গাড়ি নিয়া আসিয়া সোমনাথকে ইঙ্গিত করিল উঠিতে। সোমনাথ এই সব কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ি বিদ্যুৎবেগে চলিল। গাড়িতে বসিয়া গাড়ির জানালা খুলিতে গিয়া দেখেন শক্ত করিয়া আঁটা। খুলিতে পারিলেন না। তিনি যে কোন্ রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই ঠাহর করিতে পারিলেন না। উর্দি-পরা লোকটা পাশেই বসিয়াছিল। তাকে বা গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কোন কথার উত্তর পাইলেন না। তারা শুধু বলে, হুকুম নাই।

সোমনাথের একবার সন্দেহ হইল, তবে কি তিনি কোন অদৃশ্য শত্রুর হাতে বন্দী হইয়াছেন? তিনি ভদ্রের

নিকট পরামর্শ ও সাহায্য নিতে আসিয়াছেন, শত্রুপক্ষ ইহা কোন রকমে বুঝিতে পারিয়া কি তাঁকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিয়াছে ? সংসারে কাকে বিশ্বাস করা যায়, আর কাকে করা যায় না, বলা বড় মুস্কিল। তিনি হয়তো শ্রী ভদ্রের বাক্স পর্যন্ত পৌঁছিতেই পারেন নাই। তখন তাঁর মন স্ত্রী ও বাড়ির জন্য কেমন করিতে লাগিল।

ততক্ষণে গাড়ি থামিয়াছে। উর্দিপরা লোকটি গাড়ির দরজা খুলিয়া নামিল এবং সোমনাথকে নামিতে ইঙ্গিত করিল।

সোমনাথ নামিয়া দেখিলেন, তিনি টালিগঞ্জের এক পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে একটা একতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়াছে। উর্দিপরা লোকটি দরজায় টোকা দিতেই একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে শুধু তিনি ঢুকিলেন, আর কেহ নয়। দরজা আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল। ভীষণ ভারী লোহার দরজা। উহাই গেট। সোমনাথ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, এই দরজা সহজে খোলা যায় না। সংকেত জানা না থাকিলে বাহিরে যাইবার কোন উপায় নাই। আর সম্ভবত একবারে একজনের বেশি ভিতরে ঢুকিতে পারে না। তাঁর বুক কাঁপিয়া উঠিল।

বাড়ির অভ্যন্তর দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। আসবাবের বাহুল্য নাই। কিন্তু যেগুলি আছে, সেগুলি

দামী ও সুরুচির পরিচায়ক। মোজেক্ পাথরে তৈরি মেজে। দেয়ালগুলি পুরু। কয়েকখানা ভারতীয় চিত্র টাঙান রহিয়াছে—প্রাচীন ইতিহাসের দৃশ্য। এক কোণে একটি পিয়ানো রহিয়াছে। বুঝা গেল, যেখানে প্রবেশ করিয়াছেন, সেটি বসিবার ঘর। এটি এমন ভাবে তৈরি যে, ঐ বাটীর অপর অংশের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। বাড়ি একেবারে নিঃশব্দ। কোথাও কোন লোক আছে বুঝিবার উপায় নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ৬টা বাজিয়া ৪ মিনিট।

বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটি সঙ্গে ছিল। একটি সুন্দর সোফা দেখাইয়া সোমনাথকে বসিতে ইঙ্গিত করিল।—বাবু এখনই আসছেন। আপনাকে বসতে বললেন। বলিল সে।

—তুমি কে ?

—আমি দাসী।

দাসী চলিয়া গেল। তাকে দেখিয়া খুব বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে হইল। এখানকার দস্তুর আগাগোড়াই অন্য রকম। অযথা কৌতূহল কেহ দেখায় না। ব্যবহার অতিশয় ভদ্র। তিনি প্রথমে খানিকক্ষণ সোফার ওয়াড়ের কারুকার্য লক্ষ্য করিলেন। কেনা জিনিষ এত সুন্দর হইতে পারে না। ভদ্রের স্ত্রী কিংবা কন্যা করিয়া থাকিবেন, ভাবিলেন সোমনাথ। সামনে টিপয় ছিল।

তাতে আজিকার কাগজগুলি সাজান দেখিয়া তিনি যে কোন একখান তুলিয়া লইলেন। দেখেন 'স্বরাজ'। এ কাগজ তিনি পড়েন না। যথাস্থানে রাখিতে যাইবেন, এমন সময় একটি সম্পাদকীয়ের নিম্নলিখিত কথাগুলি তাঁর চোখে পড়িল।

"আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই কথা বলি, তাঁরা যদি শাসন-কার্য চালাইতে না পারেন, তা হইলে পদত্যাগ করুন। তাঁদের চোখের সামনে নিত্য নরহত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি ঘটিতেছে, অথচ নির্বাক দর্শকের মত তাঁরা দেখিতেছেন, ইহা আমরা আর সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। সম্প্রতি শহরে ছেলে-ধরার উৎপাতে বাপ-মারা শঙ্কিত চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। খড়গধারী নাম সহি করিয়া এক দল অনবরত ছেলে চুরি করিতেছে, এবং অভিভাবকের নিকট মোটা টাকা দাবী করিতেছে। পুলিশ আজ পর্যন্ত ইহার কোন কিনারা করিতে পারে নাই। ইহা অত্যন্ত লজ্জাকর।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্তটা পড়িয়া সোমনাথ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তা হইলে শুধু তিনি নন, তাঁর মত ভুক্তভোগী অনেক আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, তাঁর ছেলে মৈমনসিংহ হইতে চুরি হইয়াছে। কিন্তু এখন মনে হইতেছে, কলিকাতায় থাকিলেও তাঁর নিস্তার ছিল না। খড়্গধারী দল নিশ্চয় তাঁর সন্ধান রাখিয়াছিল, এবং তাঁকে বাগে পাইবার

চেষ্টায় ফিরিতেছিল। এবারকার ঢাকা যাত্রাকে তিনি ও তাঁর স্ত্রী অনেক অভিশাপ দিয়াছেন। এখন বুঝা গেল, সেটা নিরর্থক। এখন তাঁর এই কথা ভাবিয়া হাসি পাইল যে, তিনি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন রামধনের মত লোক তাঁর ছেলেকে চলন্ত ট্রেন হইতে চুরি করিয়াছিল। পুলিশের লোকেরাই বা কি!

ঠিক এই সময়ে মাঝের একটা গুপ্ত দরজা খুলিয়া একজন সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁকে দেখিলেই সমীহ করিতে ইচ্ছা হয়। বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। গৌরবর্ণ ছিপছিপে চেহারা—রঙ এত ফরসা যে. কান দুটা লাল দেখায়। লম্বায় ছ ফুট হইবেন। সামনের দিকে একটু কুব্জ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁকে সুপুরুষ বলিলে কিছুই বলা হয় না। তেজোব্যঞ্জক চেহারা। তাঁর বিশেষত্ব চোখ দুটিতে। দেখিলেই মনে হয়, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে গোপনতম চিন্তা পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন। গায়ে বেশ জোর আছে, মনে হয়। চুলগুলি ভ্রমর-কৃষ্ণ। দাড়ি গোঁফ কামান। মুখ লম্বাটে ধরণের।

অপরিচিত ভদ্রলোক সোমনাথকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, নমস্কার উকীল বাবু। এতক্ষণে আপনার ভয় গেছে তো? বিজ্ঞাপনে ৭২৩নং এ দেখা করার অর্থ বুঝেছেন তো।

—কিসের ভয় ? সোমনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, লোকটা কি অন্তর্যামী ?

—আমি ডাকাতের দলের বা শত্রুপক্ষের লোক নই। আমারই নাম শ্রীশান্তশীল ভদ্র। আপনি আমার কাছেই আসছিলেন তো ?

—হাঁ।

—আপনার দু বছরের ছেলেটি হারিয়ে গেছে। তাকে তার মার কোলে ফিরিয়ে দেবার ভার আপনি আমাকে দিতে চান ?

—হাঁ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

—স্বচ্ছন্দে।

—আমি উকীল, তা না হয় আমার পোষাক দেখে বুঝেছেন। কিন্তু আমার ছেলে হারিয়েছে, তার বয়স দুবছর, আমি আপনাকে খুঁজবার ভার দেব, এত কথা জানলেন কি করে ?

—আমার কাছে লোকে আসে কেন ? বিশেষ বিব্রত হয়েই না আসে। আর আপনার চোখে মুখে ভয় ও উদ্বেগের ছাপ রয়েছে। আপনি বুদ্ধিমান বলে চেপে রেখেছেন। ছেলে-হারান আন্দাজ করেছি, আপনার দৃষ্টি কাগজের ঐ অংশের উপর ঝুঁকেছে দেখে। শ্রী ভদ্র হাসিলেন। তারপর সোমনাথের পাশে বসিয়া সস্নেহে বলিলেন, বলুন আপনার কথা।

সোমনাথ পকেট হইতে কাল খামখানি বাহির করিয়া শ্রী ভদ্রের হাতে দিলেন। শ্রী ভদ্র চশমা বাহির করিয়া তা মনোযোগ দিয়া পড়িলেন। তারপর সোমনাথকে সিগারেট দিলেন, কিন্তু নিজে লইলেন না। বলিলেন, ভয় পাবেন না। ওরা প্রত্যেককেই ও-রকম ভয় দেখায়।

—আপনি কি এ রকম কাজ আরও হাতে নিয়েছেন ?

—নিয়েছি। কেমন করে ছেলে চুরি হল, এইবার আগাগোড়া সব বলুন।

তখন সোমনাথ পূর্বেকার সব কথা খুলিয়া বলিলেন। কেমন করিয়া ঢাকা মেল ধরিতে না পারিয়া পরদিন মৈমনসিংহ ঘুরিয়া ঢাকার পথে যান, কেমন করিয়া মৈমনসিংহ ষ্টেশনে ট্রেনে ঘুমাইয়া থাকিবার পর শেষ রাত্রে রামধনকে উঠাইয়া দিলে সে দৌড়িয়া চলিয়া যায়, কিরূপে জানিতে পারেন তাঁর দুই বৎসরের ছেলেকে ট্রেন থেকে কে বা কারা চুরি করিয়া লইয়াছে, পুলিশকে জানান হইলে তারা রামধনকে না দেখিয়া সন্দেহ করে সে ছেলে চুরি করিয়াছে, তারপর তার গ্রাম হইতে রামধনকে বাঁধিয়া আনে, যদিও ছেলে পাওয়া যায় নাই, অবশেষে সোমনাথ-গিন্নীর জেদে তাকে মুক্তি দিতে হয়, তারপর ঢাকা হইতে ফিরিয়া এই চিঠি পান, ইত্যাদি পূর্বাপর বলিতে কিছুই বাকি রাখিলেন না।

শ্রী ভদ্র সমস্তই মনোযোগ দিয়া শুনিলেন এবং মাঝে

মাঝে মাঝে এক-টা প্রশ্ন করিলেন। তারপর বলিলেন, আপনার স্ত্রী সহজ বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝেছিলেন, পুলিশ সেটুকুও বুঝতে পারে নাই। যেদিন আপনার ছেলেকে উদ্ধার করতে পারব, সেদিন সেই মহিমময়ী নারীকে একবার দেখব।

—শ্রী ভদ্র, আমার ছেলেকে কি ফিরে পাব? সোমনাথের কণ্ঠস্বরে কাতরতা প্রকাশ পাইল।

—যদি সে বেঁচে থাকে নিশ্চয় পাবেন। বলিলেন ভদ্র ধীরে ধীরে।

—আপনি কি আমাদের বাড়ি যাবেন?

—না। এখন তো দরকার নাই। আপনার ওখান থেকে তো ছেলে চুরি যায় নাই।

—না।

—কাজেই আপনার ওখানে যাবার আমার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু একটা কথা। আপনারা যখন নূতন ট্রেনে উঠেছিলেন তখন কোন কিছু কি লক্ষ্য করেছিলেন যা সচরাচর দেখা যায় না?

আশ্চর্য! এতদিন পরে সোমনাথের মনে আবার সেই দিন গাড়িতে-দেখা অসাধারণ পায়ের ছাপগুলি জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আমার একটা স্বভাব আছে গাড়িতে উঠে সব তন্ন তন্ন করে দেখা। আমিও টর্চ দিয়ে চারিদিক দেখেছিলাম। ভিজা ট্রেনে অদ্ভুত বড় বড় পায়ের দাগ দেখেছিলাম।

—আর কিছু ?

—হাঁ। আমি বাথরুমে আধ ঘণ্টা ছিলাম, তার মধ্যে ছেলে চুরি গেছে কি না বলতে পারি না। কিন্তু তখনই ধরা পড়ে। অথচ আমাদের ট্রেনের কামরা দুদিক থেকে চাবি বন্ধ ছিল।

শ্রী ভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, আপনি এখন যান। দরকার হলে আপনাকে ডাকাব। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আপনি এখন গোপন রাখবেন। আপনি যে ভাবে এসেছেন সেই ভাবে আনন্দ-বাজার আফিসে যাবেন। তারপর নিজের ব্যবস্থায় বাড়ি যাবেন।

—আচ্ছা।

তথাপি না উঠিয়া সোমনাথ ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া শ্রী ভদ্র বলিলেন, কিছু বলতে চান ?

—আমি তো আপনার ফি কত জানি না। ফিটা—

—এই কথা ! হাজার টাকা দেবেন। তাঁর কমে পারব না। হ্যাঁ, ভালো কথা। আমাকে না জানিয়ে কাউকে কোন টাকা দেবেন না, দশ হাজার টাকা তো দূরের কথা।

—আচ্ছা।

সোমনাথ বিদায় লইলেন। তখন শ্রী ভদ্র বিষয়ান্তরে মন দিয়াছেন। সোমনাথ যাইতে যাইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ৭টা বাজিয়া ৩৩ মিনিট।

৬। পথে বিপদ

সোমনাথ বর্মণ ষ্ট্রীটে পৌছিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, প্রতিদিনকার মত ট্রামে বাসে গেলে বাড়ি পৌছিতে রাত্রি সাড়ে আটটা হইয়া যাইবে। সোমনাথ-গিন্নী না জানি কতই শঙ্কা ও উদ্বেগ বোধ করিতেছেন! আর দেরী করিতে তাঁর মন চাহিল না। তাছাড়া তাঁর মন কেবলই বলিতে লাগিল, তাঁর বাড়ি থাকা প্রয়োজন। সোমনাথ-গিন্নীকে একা থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। কখন কি ঘটে, কেহ কি বলিতে পারে? এত দেরী করা তাঁর অন্যায় হইয়াছে। আচ্ছা, শান্তশীল ভদ্র তো ইচ্ছা করিলেই তাঁর বদ্ধ মোটর গাড়ি দিয়া তাঁকে বাড়ি পৌছাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। কেন করিলেন না? নিশ্চয় তার কোন দৃঢ় অর্থ আছে। বিনা কারণে কোন কাজ করিবার পাত্র ভদ্র নন। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া ধরাচূড়া ছাড়িতে পারিলে তিনি বাঁচেন। এই সব ভাবিতে ভাবিতে যেমন তিনি আনন্দবাজার আফিস ছাড়াইয়া দুপা অগ্রসর হইয়াছেন, অমনই এক পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-চালক—তার ইয়া গালপাট্টা দাড়ি—দূর হইতে হস্ত-সংকেতে তাঁকে থামিতে বলিল ও জিজ্ঞাসা করিল,

—বাবু, ট্যাক্সি?

তাড়াতাড়ির জন্য হয়তো সোমনাথ সেই ট্যাক্সিতেই চড়িয়া বসিতেন। কিন্তু যেমন তাঁর স্বভাব, তিনি পকেট

হইতে টর্চ জ্বালিয়া ট্যাক্সির নম্বরের উপর ফেলিলেন। দেখিলেন, সেটা কলিকাতার গাড়ির নম্বর না। তাঁর মনে একবার প্রশ্ন জাগিল, এ গাড়ি কোথা হইতে আসিল? তিনি তাতে উঠিলেন না। না উঠিবার আরও একটা কারণ ছিল। তাঁর স্বাজাতিক প্রেম প্রবল। সেজন্য পারৎ পক্ষে জিনিষ কিনিতে বা ভাড়া করিতে বাঙ্গালীর কাছে ছাড়া করিতে চান না।

ট্যাক্সি-চালক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,

—বাবু, ট্যাক্সি?

তিনি হাতের ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করিলেন। মনে হইল, সে ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল।

তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বাঙ্গালী-চালিত এক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,

—জোরে হাঁকাও।

তাঁর দেওয়া ঠিকানার দিকে ট্যাক্সি উল্কাবেগে চলিতে লাগিল। বোধ হয়, এক মিনিটও যায় নাই, পুলিশ হাত দেখাইতেই থামিতে হইল। পিছনে অনেকগুলি গাড়ি আসিতেছিল। কৌতূহল বশে একবার পিছনের গাড়ি-গুলির দিকে তাকাইতে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। দেখেন, তৃতীয় গাড়িখানা সেই পাঞ্জাবী চালকের। অবশ্য, সওয়ারি পাইবার আশায় যে কোন পথে ছুটিবার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে। কিন্তু কে যেন তাঁর কানের

কাছে বার বার বলিতে লাগিল, সাবধান হও, সাবধান হও। তিনি হলফ করিয়া বলিতে পারেন, তিনি স্পষ্ট এই সাবধান-বাণী শুনিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণে তিনি নিজের মনে নিজে হাসিয়া উঠিলেন। ডিটেকটিভের সাহায্য নিতে গিয়া কি তাঁর মতিভ্রম হইল? সর্বত্র বিপদ দেখিতেছেন! ট্যাক্সি-চালক তার নিজের কাজে যাইতেছে না, এমন কি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন? পুলিশ হাত ছাড়িয়া দিল। এক মিনিট চলিবার পর তাঁর মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। ভালো, দেখা যাক না, সত্যই ও অনুসরণ করিতেছে কি না। এই ভাবিয়া তিনি তাঁর ট্যাক্সি-চালকের প্রায় কানে কানে বলিলেন,

—বালিগঞ্জ চলো।

বাঙ্গালী ট্যাক্সি-চালক একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, হয়তো কোন কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে। তার আর আপত্তি কি? টাকা পাইলেই হইল। বেশি টাকা হইলে তো ভালোই। সে গাড়ি ঘুরাইয়া উল্টাদিকে নক্ষত্রবেগে চলিল। এইবার চকিতের মধ্যে পাঞ্জাবী চালকের গাড়ির পাশ দিয়া তাঁরা বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সোমনাথ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, গাড়ি খালি নয়, পরিপূর্ণ সাহেবি পোষাক পরা একজন আরোহী আছে। সে কোন্ দেশের লোক তা বলা কঠিন। চুপ করিয়া গাড়ির ভিতরে অন্ধকারে বসিয়া আছে

মুখের আদলটা পাওয়া যায়, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়। সোমনাথের গাড়ি তার গাড়ির পাশ দিয়া গেলেও তাঁকে একটুও বিচলিত দেখা গেল না। সোমনাথ নিজেকে নিজেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওরে সোমনাথ, তোর সব তাতেই ভয়।

এখন মোটর গাড়ির চালককে তিনি আবার উল্টা পথে ফিরিতে বলেন কি প্রকারে? সে কি তাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে করিবে না? তিনি চান তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া যাইতে, আর একি জ্বালা তিনি নিজেই সৃষ্টি করিতেছেন। পাঁচ মিনিট অতীত হয় নাই, তিনি ফিরিয়া দেখেন, পাঞ্জাবী চালকের গাড়ি প্রায় কুড়ি গজ পিছনে তাঁকে অনুসরণ করিতেছে। ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি নিজের গাড়ি দ্রুত হাঁকাইতে বলিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলেন, তারপর গতি মন্দ করিলেন। দেখেন, সে আসিতেছে। একবার তিনি পার হইতেই পুলিশ হাত বাড়াইয়া পিছনের গাড়িগুলি রোধ করিল। সুযোগ বুঝিয়া তিনি এলগিন রোডে ঢুকিয়া ল্যান্সডাউন রোড দিয়া সোজা উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর নির্দেশমত গাড়ি সার্কুলার রোডে পড়িল। তিনি ধীর গতিতে শিয়ালদহের দিকে ছুটিলেন। ভাবিলেন, আপদের হাত হইতে বাঁচা গেল। সে যে বর্মণ ষ্ট্রীট হইতে তাঁর সঙ্গ লইয়াছিল, সন্দেহ রহিল না।

ভাগ্যে তিনি পাঞ্জাবীর গাড়িতে উঠেন নাই। উঠিলে কি হইত, ভাবিতেও তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। নিরীহ সাধারণ উকীল মানুষ তিনি। তাঁর কেন এ শাস্তি। ছেলেটাকে চুরি করিয়া লইয়াছে, পাওয়া যাইবে কি না কে জানে। তাতেও নিস্তার নাই। এখন আবার তাঁর পিছনে ধাওয়া করিয়াছে। এ যে সেই খড়্গধারীর দল, তাতে ভুল নাই। কিন্তু কেন তাঁকে তাড়া করিতেছে, বুঝিতে পারিলেন না।

সেই শীতের রাত্রে তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল। তাঁর কপাল দিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। এতক্ষণে তাঁর ট্যাক্সি-চালক ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজ করিতে পারিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, সোমনাথ বিপদে পড়িয়াছেন। সে তাঁকে সাহস দিয়া বলিল,

—ভয় নাই, বাবু ভয় নাই। আমি থাকতে ও-শালা আপনার কিছু করতে পারবে না।

—ওকে চেন না কি? বলিলেন সোমনাথ উৎকণ্ঠিত ভাবে।

—না। আজ কয়েকদিন যাবৎ নতুন দেখছি।

—কোথাকার গাড়ি?

—বজবজের।

—তা তোমাদের এখানে দাঁড়াতে দাও কেন?

—বাবু, কেই বা দেখছে, আর কেই বা বলছে?

—যাক্, শালা বোধ হয় আর আমাদের ধরতে পারবে না।

—আপনাকে বাড়ি পৌছে না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। এখন বাড়ি যাবেন তো ?

—হাঁ।

সোমনাথের গাড়ি মাত্র মৌলালি ছাড়াইয়াছে, এমন সময় দেখা গেল, ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া সেই গাড়ি নক্ষত্রবেগে আসিয়া পড়িল। আধ ইঞ্চির জন্য সোমনাথের গাড়ির সঙ্গে গুরুতর ধাক্কা লাগিল না, চালক অতি কৌশলে গাড়ি বাঁচাইল। কিন্তু সামনের কাঁচ রক্ষা পাইল না, ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। চালকের হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য এই, অভিযোগ করিবার যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তা হইলে বাঙ্গালী চালকটিরই ছিল, পাঞ্জাবী চালকের নহে। কিন্তু পাঞ্জাবী চালক তার গাড়ি থামাইয়া হাতের আস্তিন গুটাইতে লাগিল আর চোস্ত হিন্দীতে বাঙ্গালী চালককে গাল দিতে লাগিল।

সে সোমনাথের দিকে ফিরিয়া বলিল,

—দেখলেন বাবু কাণ্ড। দোষ করল নিজে, আর মারতে আসে আমায়। ও শূয়ারের বাচ্চা, তুমি ভেবেছ কি। দোষটা আমার না তোমার ? তোমাদের যতদিন মেরে না তাড়াতে পারছি, ততদিন শান্তি আসবে না, আর আমাদেরও ব্যবসা ভাল হবে না।

পাঞ্জাবী রারকয়েক কেঁও কেঁও করিয়া বীর-দর্পে অগ্রসর হইল। এমন সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া পড়িল। সোমনাথকে চিনিত। সমীহ করিয়া বলিল,

—লাগে নাই তো, সার ?

—না।

পুলিশ পাঞ্জাবী চালকের নম্বর লিখিয়া বিদায় করিয়া দিল। বাঙ্গালী চালককে সামনের ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধাইয়া দিল। তারও গাড়ির নম্বর টুকিয়া রাখিল। সোমনাথকে বলিল,

—বাড়ি যান, সার।

সমস্ত ঘটনা ঘটিতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে নাই। সোমনাথের মন বিকল হইয়া গেল। দূর হোকগে ছাই, পাঞ্জাবী চালক যদি তাঁর পিছনে পিছনে আসে, আসুক। তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি কিই বা করিতে পারিবেন ? তিনি তাঁর চালককে হুকুম দিলেন,

—সোজা চলো।

দু একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবী চালকের আর কোন উদ্দেশ পাইলেন না।

যেইমাত্র নড়িয়া চড়িয়া তাঁর গদিতে ভালো হইয়া বসিলেন, অমনই খস খস করিয়া একটা শক্ত কাগজ তাঁর হাতে ঠেকিল। তিনি টর্চ জ্বালিয়া দেখিলেন, লাল কালিতে কি সব লেখা রহিয়াছে। তখন মোটরের

ভিতর দেশলাই জ্বালিয়া তিনি পড়িলেন: কালো বর্ডার দেওয়া লাল কালিতে লেখা নিম্নলিখিত ইংরেজি কথাগুলি।

প্রিয় মহাশয়,

আপনাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, পুলিশের সাহায্য লইবেন না। আপনি সে অনুরোধ রাখেন নাই। আপনি শ্রী ভদ্রের নিকট গিয়াছিলেন। সুতরাং আপনার জীবন নিরাপদ রাখিবার দায়িত্ব আমাদের রহিল না। এখনও তাড়াতাড়ি টাকাটা দিলে প্রাণে বাঁচিবেন ও ছেলে ফিরিয়া পাইবেন।

—খড়্গধারী

চিঠি পড়িয়া সোমনাথ চমৎকৃত হইলেন। বুঝিতে পারিলেন, এই চিঠিটা তাঁকে দিবার জন্য এতক্ষণ ধরিয়া মোটর-চালক তাঁকে অনুসরণ করিয়াছিল। কারণ, তাঁর ঠিকানা এদের কাছে অজ্ঞাত নয়, তা তো এর আগে টাকা চাহিয়া চিঠি লিখিতেই বুঝা গিয়াছে। কারও উপর ভার ছিল, এই চিঠিটা রাস্তায় তাঁকে দিতে। কি করিয়া এটা তাঁর গাড়ির ভিতর আসিল, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সম্ভবত তাঁর মোটরের কাচ ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেহ ছুঁড়িয়া দিয়া থাকিবে, তিনি টের পান নাই। কিন্তু তিনি যে বর্মণ ষ্ট্রীট হইয়া শ্রী ভদ্রের কাছে

যাইবেন, এবং আবার বর্মণ ষ্ট্রীট হইয়া বাড়ি ফিরিবেন, তা খড়্গধারীরা এত শীঘ্র জানিল কেমন করিয়া? স্বীকার করিতেই হইবে তাদের গোয়েন্দারা অকর্মণ্য বা অপটু নয়। এবং প্রত্যেক শিকারের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার লোক তাদের আছে।

এখন উপায় কি? ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। খড়্গধারীর এই চিঠি লইয়া এখন আবার টালিগঞ্জ দৌড়ান অসম্ভব। পুলিশকে জানাইতে প্রবৃত্তি হইল না। যা করিবেন, ধীরে সুস্থে ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল সকালে করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি নামিয়া পড়িলেন। টর্চ ফেলিয়া দেখিলেন মিটারে ১০৷৹ টাকা উঠিয়াছে। তিনি তা মিটাইয়া দিতেই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাঙ্গালী চালকটি তাঁকে নমস্কার করিল। সোমনাথ বলিলেন,

—কষ্ট হচ্ছে কি?

—না।

—আমি তোমার জন্য বড়ই দুঃখিত—

—আপনার তো কোন দোষ নাই। আপনি যে আঘাত পান নাই, এতেই আমি খুসি।

মোটর-চালক তাঁর কেউ নয়। বাঙ্গালী, এই মাত্র। অথচ হয়তো বাঙ্গালীর দলই তাঁর সর্বনাশ করিবার জন্য

উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। মানুষের চরিত্র যে কত ভিন্ন রকমের হয়! সোমনাথ বলিলেন,

—না, আমার লাগেনি। তোমারও না লাগলে আমি খুসি হতাম। যাই হোক, অবহেলা কোর না।

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, একটা কথা। তোমার গাড়ির সামনের কাঁচ তো ভেঙ্গে গেছে—

—গাড়ি আমার বীমা করা আছে।

—এ নিয়ে পুলিশ কেস করবে তো?

—নিশ্চয়।

—আমাকে শুধু সেদিন কষ্ট করে খবরটা দিও।

—আপনার নামে তো সাক্ষী হিসাবে সমনই আসবে।

—ও।

—আপনি তো দেখেছেন, আমার কোন দোষ ছিল না।

—না, তোমার দোষ ছিল না।

—আপনি শুধু সেই কথাটা বলবেন।

—নিশ্চয় বলব। আর পুলিশও তোমার বিপক্ষে যাবে না। সে তো নিজেই সব দেখেছে।

—তা, বিশ্বাস নাই। আপনার সাক্ষ্য আমার খুব জোর হবে।

—ভয় নাই তোমার, আমি সত্য কথা বলব।

মোটর-চালক নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। সোমনাথ বুঝিতে পারিলেন, তাঁর চিঠির কথা সে কিছুই জানে না। তার সঙ্গে সে বিষয়ে কোন আলোচনা করা তিনি সমীচীন বিবেচনা করিলেন না। সে-কথা সে তুলিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, উহা কিরূপে গাড়ির ভিতরে আসিল। সে কিছু বলে নাই, তাই তিনিও তা চাপিয়া গেলেন।

৭। বাপের বাড়ি

সোমনাথ-গিন্নী ঘর-বাহির করিতেছেন। দুদণ্ড কোথাও স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। কি করিয়া থাকিবেন? বিবাহের পর শ্বশুর-গৃহে আসা অবধি যে সোমনাথকে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে কাচারির পর সোজা বাড়ি চলিয়া আসিতে দেখিয়াছেন, আজ সেই সোমনাথের এই ব্যতিক্রম দেখিয়া তাঁর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কখনও সোমনাথের দেরী হয় না, একথা বলিতে পারি না। তিনি সর্বদা পূর্বাহ্ণে জানাইয়া যান, অথবা বাড়ি ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া যান। জীবনে এই প্রথম তিনি তাঁর অন্য রকম ব্যবহার দেখিলেন। তাঁর মনে আশঙ্কার অন্ত রহিল না। পথে কেহ সোমনাথের অনিষ্ট করে নাই তো? তাঁর কপালে ভগবান কত দুঃখ না জানি লিখিয়াছেন!

রাত্রি আটটা বাজিল, নয়টা বাজিল, তবু সোমনাথের দেখা নাই। সোমনাথ-গিন্নী রামধনকে ডাকিলেন,

—রামধন!

—আজ্ঞে।

—কি করি বল তো।

ঐ এক প্রশ্ন তিনি রামধনকে অসংখ্যবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রতিবারই বৃদ্ধ অসংকোচে উত্তর দিয়াছে,

—শান্ত হও মা। ভয় নেই, কোন ভয় নেই। বাবু ফিরে আসবেন।

—নিশ্চয় আসবেন তুমি বলছ?

—নিশ্চয়।

—কোন দিন তো এত দেরী করেন না।

—তা জানি। আজ এমন কাজ পড়েছে যার জন্ম তোমায় কষ্ট দিয়েও দেরী করছেন। চাই কি খোকার খোঁজ পেয়েছেন।

সোমনাথ-গিন্নীর চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল:

—তুই তাই মনে করিস্?

—হাঁ।

—তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। কিন্তু যতক্ষণ ফিরে না আসছেন, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

রামধন মূর্খ, পাড়াগেঁয়ে, কিন্তু অন্তরটা সভ্য মানবের মত। সুতরাং তার বুদ্ধিমত সে সোমনাথ-গিন্নীকে যথা-

সাধ্য সান্ত্বনা দিয়া রাখিতেছে। আর বুঝি পারে না। একে বাবার অসুখের তার পাইয়া উদ্বেগের সীমা নাই, তার উপর আজ যখন সোমনাথের তাড়াতাড়ি বাড়ি আসা অত্যন্ত দরকার, তখন নয়টা বাজিয়া গেল, অথচ সোমনাথের দেখা নাই। পীড়িত বাপের শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া যাইবার জন্য মন ছটফট করিতেছিল, এমন সময় একি দুর্দৈব। এই কাল-রাত্রি আর কি কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন?

সোমনাথ-গিন্নী কাতর ভাবে বলিলেন,

—আচ্ছা রামধন, এক কাজ করলে কেমন হয়? চল তুমি আর আমি তাঁকে খুজতে বেরিয়ে যাই।

—কোথায় খুঁজবে? মাথা নাড়িল রামধন।

—কেন, আদালতে।

—আদালত কি এখনও খোলা আছে।

—তা বটে।

—তিনি কোথায় গেছেন, কি করেছেন, কিছুই জানি না। আমরা বেরিয়ে গেলে তিনি যদি আসেন, তাহলে আবার তিনি ব্যস্ত হয়ে তোমার সন্ধানে বেরুবেন। কাজেই অপেক্ষা করা ভালো।

এমন সময় বাহিরে ট্যাক্সি থামিবার শব্দ হইল। সোমনাথ-গিন্নী ও রামধন দৌড়াইয়া নিচে নামিতেই সিঁড়ির তলায় সোমনাথের সঙ্গে দেখা। সোমনাথ-গিন্নী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনেক কষ্টে যে

ধৈর্য ধরিয়াছিলেন, স্বামীকে দেখিয়া তা আর রাখিতে পারিলেন না। সোমনাথ যত তাঁকে সান্ত্বনা দেন, তত ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদেন।

সোমনাথ হাঁক দিলেন

—রামধন! রামধন!

রামধন ক্ষণেকের মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। ডাক শুনিয়া কাছে আসিল। রামধনকে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কি হয়েছে রে?

রামধন সকল কথা খুলিয়া বলিল। জানাইল, দুপুর হইতে মার মন খারাপ হইয়া আছে। দেশ হইতে তার আসিয়াছে, বাপের বড় অসুখ, বাঁচিবেন কিনা সন্দেহ। সেই হইতে বাপের বাড়ি যাইবার জন্ত তাঁর মন ছুটিয়াছে। আর আজই তাঁর আসিতে এত দেরী! কোন-দিন তাঁর দেরী হয় না, তিনি কাচারির পর সোজা বাড়ি চলিয়া আসেন। ছেলে হারাইয়া অবধি মা কি আর মা আছেন? তার উপর বাপের ব্যামো। তার উপর আজই আবার সোমনাথের এত রাত পর্যন্ত অনুপস্থিতি। ভাবনা কার না হয়। উদ্বেগ ও আশঙ্কায় মা আধমরা হইয়া গিয়াছেন। ভৃত্যের কথার মধ্যে তিরস্কার হয়তো ছিল, কিন্তু সোমনাথ গায়ে মাখিলেন না। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন,

—আমার সব কথা শুনলে আর রাগ থাকবে না। দেখি একবার তারখানা।

সোমনাথ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তারটা পরীক্ষা করিলেন। না, ইহাকে সন্দেহ করা যায় না। শ্বশুর মহাশয় তা হইলে সত্যই পীড়িত হইয়াছেন। নিজে যাইতে পারিবেন না, কিন্তু স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিবেন। দরকার হইলে পরে নিজে যাইবেন। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিলেন।

ইহার পর হাত মুখ ধুইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে সোমনাথ স্ত্রীর নিকট আজিকার দিনের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। রামধন পা টিপিতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া সোমনাথ-গিন্নীর গায়ে বার বার কাঁটা দিয়া উঠিল। তিনি বার বার বলিলেন,

—কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

এবং গলায় আঁচল জড়াইয়া অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিলেন। স্বামীর নিকট সব কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,

—এমন কাজ তুমি কেন করতে গেলে?

—কি।

—শ্রী ভদ্রের কাছে কেন গেলে?

—বাঃ, ডাকাতের দল অন্যায় করে বেড়াবে, আর আমি চুপ করে থাকব? দেখলে তো আমি ঠিকই করেছি।

আরও অনেক লোকের শিশুকে ওরা ঐভাবে চুরি করেছে। ভেবে দেখ দেখি, সেই সব বাপ-মায়ের মনের অবস্থা কি রকম হয়েছে! এই অন্যায়ের প্রতীকার করতে না পারলে, আমাদের মানুষ বলে গর্ব করার কিছু নাই।

সোমনাথ-গিন্নী স্বামীর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য চিরকাল লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ওকালতি করিলেও তাঁর নৈতিক বোধ অতিশয় জাগ্রত ছিল। অন্যায়ের সঙ্গে রফা করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ট্যাক্সিতে যে চিঠিখানা সোমনাথ পাইয়াছিলেন, তার কথা মনে পড়ে আর বুক দুর দুর করিয়া উঠে।

অনেক ক্ষণ পরে সোমনাথ-গিন্নী আস্তে আস্তে বলিলেন,

—কিন্তু দেখ, ওরা সর্বদা তোমার খবর রাখছে।

—তাতো রাখবেই। আমি পুলিশের সাহায্য নিচ্ছি কি না তাতো ওদের জানা দরকার। ট্যাক্সি যারা হাঁকায় তাদের মধ্যে পর্যন্ত ওদের লোক আছে। এর পরে কোন লোককে সহজে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে না। অবশ্য শ্রী ভদ্রকে আমি কালই জানাব সব।

—তুমি বলছিলে আরও অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ওরা চুরি করেছে। তাহলে তাদের প্রত্যেকের বাপের পিছনেই তো চর রেখেছে। কত বড় দল তা হলে ওরা?

—বড় দল, সন্দেহ নাই।

এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রামধন ধরিল। সোমনাথ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন,

—এত রাত্রে কে আবার ফোন করে? তাঁর মুদ্রা-দোষ ঘড়ি দেখা—১০টা বাজিতে ২৩ মিনিট বাকি।

রামধন বলিল,

—শ্রী ভদ্র।

সোমনাথ তাড়াতাড়ি গিয়া ফোন ধরিলেন। তখন সেই অদৃশ্য লোকের সহিত তাঁর নিম্নলিখিত কথাবার্তা হইল।

—কে?

—আমি শ্রী ভদ্র।

—নমস্কার। কি বলছেন?

—আমি একবার সোমনাথ বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই। যিনি আজ আমার কাছে এসেছিলেন।

—আমিই সোমনাথ।

—ও, নমস্কার। ফোনে আপনার গলাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। (হাসি) আমি একবার কারও গলা শুনলে সহজে ভুলি না।

—কিছু বলবেন?

—হাঁ।

—কি বলুন তো?

—ওখানে আর কেউ নেই তো?

—না, আমার স্ত্রী আছেন।

—তা থাকুন। অন্য কেউ ?

—না।

—বেশ। আমি বলছিলাম যে খুব সাবধানে থাকবেন। দেখলেন তো আজ রাস্তায় কি কাণ্ড হল। আমার কাছে এসেছিলেন, তার খবরও ওরা রেখেছিল। ট্যাক্সি করে আপনার পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল। আজ আপনার কোন অনিষ্ট করা ওদের উদ্দেশ্য ছিল না। আপনাকে শুধু সেই চিঠিটা পৌছে দেবার ভার ছিল। পেয়েছেন তো ?

—পেয়েছি। বলিলেন সোমনাথ। কিন্তু বিস্ময়ে তাঁর বাক্-রোধ হইবার উপক্রম হইল। আশ্চর্য শক্তি শ্রী ভদ্রের। ঘটনা ঘটিতে না ঘটিতে কি করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন সব ? লোকটা কি অন্তর্যামী ? কিন্তু গলার স্বরটা যেন খাপ খাইতেছে না। শ্রী ভদ্রের গলা গম্ভীর অথচ মোলায়েম। এ গলা নরম বটে কিন্তু কর্কশ। সাবধানের মার নাই। স্থির করিলেন, নিজে হইতে কিছু বলিবেন না।

তাঁর মনের কথা টের পাইয়া যেন অপর ব্যক্তি বলিলেন,

—আমি শ্রী ভদ্রই কথা বলছি। ভয় পাবেন না।

আপনার ছেলেকে আমি শীগ্‌গির উদ্ধার করে আনব। চিঠিটাতে ওঁরা কি লিখেছে পড়ে শোনান দেখি।

—তা কি উচিত হবে। ওরাও তো অনেক সময় ফোন ধরার চেষ্টা করে। ফোনে বেশি কথাবার্তা না কওয়া ভালো। ফস্ করিয়া বলিলেন সোমনাথ। এ বুদ্ধি তাঁর মাথায় কেন আসিল, তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না।

—আমাকেও অবিশ্বাস! অপর দিকে হাসির শব্দ শোনা গেল। বেশ। বেশ। খুব খুসি হলাম। সর্বদা এই রকম হুঁসিয়ার থাকবেন। কাল আসছেন তো?

—দেখি।

—আপনাকে দরকার। আমি কাজ তাড়াতাড়ি সারতে চাই। আরও অনেকগুলি হাতে নিয়েছি কি না।

—আচ্ছা।

সোমনাথ হাতল ছাড়িয়া দিলেন।

সোমনাথ-গিন্নী বলিলেন,

—আচ্ছা, বাবার অসুখের তারটা সম্বন্ধে ওঁর কাছে পরামর্শ নিলে না কেন?

—ক্ষেপেছ! ফোনে কখনও অত কথা বলে? বিশেষ যখন এত বিপদের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি।

রামধন গম্ভীর ভাবে বলিল,

—বাবু, ঠিকই করেছেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া সারিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। সোমনাথ-গিন্নীর অত্যন্ত ভয় ভয় করিতেছিল। সেজন্য রামধনকে ভৃত্যদের শোবার জায়গায় এক তলায় পাঠান হইল না। দোতলায় স্বামী-স্ত্রীর বন্ধ ঘরের দরজার বাহিরে বারান্দায় সে শুইয়া রহিল।

সোমনাথ স্ত্রীকে নিজের সংকল্পের কথা জানাইলেন, পরদিন পাটনায় তিনি বাপের বাড়ি যাইবেন। সোমনাথ-গিন্নী বলিলেন,

—আমার যাওয়া উচিত। কিন্তু তোমাকে একা ফেলে যেতে মন সরছে না।

—আমার তো এখন যাওয়া চলে না।

—জানি। আমি না হয় নাই গেলাম।

—তা কি হয়? জরুরী তার। তার মানে তোমার যাওয়া খুব দরকার। চাই কি, তোমায় দেখলে ভাল হয়ে উঠবেন।

—তুমি যে একা থাকবে।

—একা কোথায়। হাস্য করিলেন সোমনাথ। তাছাড়া তোমার অত্যন্ত বিশ্বাসী রামধন থাকল।

—সত্যি, ও খুব বিশ্বাসী। ও না থাকলে, তোমায় একা ফেলে কিছুতেই যেতাম না।

—তবে নিশ্চিন্ত মনে যাও।

—নিশ্চিন্ত আর হতে পারি কৈ। একটা কথা দাও।

—কি ?

—আমি তার করলে তৎক্ষণাৎ চলে যাবে।

—যাব। কিন্তু মিছামিছি তার করবে না।

—না, করব না।

পরদিন ভোরবেলা জরুরী তার করিয়া দেওয়া হইল, সোমনাথ গিন্নীর বাবাকে,—আপনার কন্যা রওনা হইলেন। ষ্টেশনে লোক রাখিবেন। রাত্রির গাড়িতে সোমনাথ-গিন্নী পাটনা রওনা হইলেন। গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত বার বার মাথার দিব্য দিয়া স্বামীকে সাবধানে থাকিতে বলিলেন এবং রামধনকে বলিলেন,

—বাবা রামধন, সর্বদা কাছে থেকো।

—আমার প্রাণ থাকতে বাবুর অনিষ্ট হবে না। মনের কথা গুছাইয়া বলিবার ভাষা রামধনের নাই। নইলে বলিত, তোমাদের উপকার আমি কি জীবনে ভুলিতে পারি ?

সোমনাথ রামধনকে লইয়া মোটরে স্বগৃহে ফিরিলেন।

পর দিন নির্বিঘ্নে পাটনা ষ্টেশনে পৌছিয়া সোমনাথ-গিন্নী দেখিলেন, ষ্টেশনে কালু খুড়ো দাঁড়াইয়া আছে।

ট্রেন হইতে নামিবার পূর্বেই সোমনাথ-গিন্নী চেঁচাইয়া উঠিলেন, কাকা, আগে বল, বাবা কেমন আছেন ? গিয়ে দেখতে পাব তো ?

কালু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল,

—দেখতে পাবি মানে? তোর বাবার কি হয়েছে যে দেখতে পাবি না? আর তুই বা এমন অসময়ে পাটনা এলি কেন?

সমস্ত পথ সোমনাথ-গিন্নীর অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়াছে। যতই পথ শেষ হইয়া আসে, ততই তাঁর ব্যাকুলতা বাড়ে। এখন কালু কাকার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবার পালা তাঁর। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কেন, বাবার খুব অসুখ করে নি?

—না তো।

—তরুণ আমায় বাবার খুব অসুখের কথা জানিয়ে তার করে নি?

—না তো।

তারটা সঙ্গেই ছিল। সোমনাথ-গিন্নী বাহির করিয়া কালুর হাতে দিলেন। সে পড়িয়া ফিরাইয়া দিল।

—এ তার আমরা করি নি। তোর বাবা বেশ ভালো আছে, চোখে দেখতে পাবি। বলিল কালু গম্ভীর ভাবে।

পাটনা হইতে তার গিয়াছে, সন্দেহ মাত্র নাই। অথচ তার মিথ্যা, বাবার ব্যারাম মিথ্যা। সেখানে কি অবস্থায় না স্বামীকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে! বাবার অসুখ করে নাই, এ কথা শুনিয়া একদিকে যেমন

সোমনাথ-গিন্নী আশ্বস্ত হইলেন, অন্যদিকে তেমন সোমনাথের সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, এ শত্রুদের কাজ। তাদের উপর তাঁর আর কিছুমাত্র কোমলতা রহিল না। ঠিকই করিয়াছেন স্বামী, এই মানব-শত্রুদের ধরাইবার চেষ্টা করিয়া।

ছেলে-চুরির কথা সোমনাথের শ্বশুর-বাড়িতে কেহ জানিত না। এখন তাঁরাও সকলে উদ্বিগ্ন হইলেন, বিশেষ করিয়া সোমনাথের জন্য। সোমনাথের শ্বশুর বলিলেন,

—মা, হুট্ করে তোমার চলে আসাটা ঠিক হয় নি।

—জানব কি করে বাবা যে সব মিথ্যে।

—তা বটে। কিন্তু একবার তারে খবর নিলে পারতে আমি কেমন আছি। তারপর যথাকর্তব্য ঠিক করতে।

কিন্তু বাবার অসুখের সংবাদে না কি কারও মাথা ঠিক থাকে! আর, কেহ যে এমন চালাকি করিবে তিনি বুঝিবেন কি করিয়া। তিনি এখন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন।

৮। অনুসন্ধান

শান্তশীল ভদ্র তাঁর বাইরের ঘরে বসিয়া আছেন। দেখিয়া মনে হয়, তিনি একাগ্রমনে সমুখের খবরের কাগজটা পড়িতেছেন। আসলে তাঁর মন অন্যত্র বিচরণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া তিনি ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিলেন। দু একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তারপর আলমারি হইতে একটা মানচিত্র বাহির করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

মানচিত্রের কয়েক জায়গায় তিনি লাল পেন্সিলে দাগ দিলেন। তারপর ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখেন, সকাল ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি ঘণ্টা টিপিতে দাসী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। ভদ্র মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,

—গাড়ি বারান্দায় লাগাতে বল।

—যে আজ্ঞে।

—আমি এখনই বেরুব।

—কখন ফিরবেন?

—ঠিক বলতে পারছি না। দেরী হলে, কিংবা আজ না ফিরলে ব্যস্ত হবে না।

দাসী জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ভদ্র বলিলেন,

—যাও।

এমন সময় বাইরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়া জানাইয়া দিল, আগন্তুক আসিয়াছে।

দাসী পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল, একজন যুবক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ভদ্র অপাঙ্গে দাসীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

—চেন তাকে?

—না।

—আর কখনও দেখ নি?

—না।

—আসতে বল।

দাসী যাইতে যাইতে ভাবিল, কর্তার মুখে হাসি কেন।

ধুতি, চুড়িদার পাঞ্জাবী পরণে, চোখে কালো চসমা, হাতে হাত ঘড়ি ও ছড়ি, মুখে চুরুট, বুকপকেটে রুমাল, পায়ে স্যাণ্ডেল, এক সুদর্শন যুবক আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। বয়স উনিশ কুড়ি হইবে। হঠাৎ দেখিলে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয়।

ভদ্র বলিলেন,

—বস।

সে পাশের চেয়ারটায় বসিল।

মিনিট পাঁচেক চুপি চুপি তাঁদের কি কথাবার্তা হইল, দাসী তা বুঝিতে পারিল না। সে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তার ভাব দেখিয়া আগন্তুক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দাসীর দিকে চাহিয়া সে বলিল,

—ছি ছি, মাসি, ঠকিয়ে দিয়েছি তোমায়। চিনতে পারলে না তো ?

গলার স্বর শুনিয়া দাসী লজ্জিত হইল। আরে এ যে শ্রী ভদ্রের সহকারিণী মন্দাকিনী। পুরুষের বেশে তাকে চেনাই যায় না। দাসীর নিশ্চয় চেনা উচিত ছিল। এখন অপ্রতিভ হইয়া বলিল,

—বাস্তবিক আমি ঠকে গেছি।

ভদ্র বলিলেন,

—কিন্তু বাইরের লোকে ওকে দেখলে চিনতে পারবে বলে মনে কর কি ?

—না।

মন্দাকিনীকে শ্রী ভদ্র নিজে সাহায্যকারিণী রূপে বাছিয়া লইয়াছেন। সে বুদ্ধিমতী, সুন্দরী। নিজের ভোল অত্যন্ত সহজে বদলাইতে পারে। যে কাজ করিতে দেওয়া হয় প্রাণপণে করে। বিশ্বাসী। সাহসীও বটে। টাইপ করিতে পারে। অন্য সহকারী থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে এতগুলি গুণ থাকায় শ্রী ভদ্রের নিকট তার আদর খুব বেশি।

মন্দাকিনী যখন কাজে নামে, তখন তার পুরুষের ছদ্মবেশ থাকে এবং তার নাম হয় শ্রী ভঞ্জ। তারা বহু

কাল ময়ূরভঞ্জের অধিবাসী বলিয়া শ্রী ভদ্র তার এই নামকরণ করিয়াছেন। কাজ করিতে গিয়া ভঞ্জ ভুলিয়া যায়, সে পুরুষ না স্ত্রীলোক। ভদ্রও তার সঙ্গে সতীর্থের মত ব্যবহার করেন।

দুইজনে অল্পক্ষণ সোমনাথের ছেলে চুরির ব্যাপার আলোচনা হইল। শ্রী ভদ্র বলিলেন,

—আচ্ছা ভঞ্জ, তুমি যে সোমনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, কোন নূতন খবর আছে কি ?

—আজ্ঞে হাঁ। অনেক ঘটনা ঘটেছে। এই বলিয়া পরশু রাত্রে সোমনাথকে বর্মণ ষ্ট্রীটে ছাড়িবার পর যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, ভঞ্জ সেগুলি আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল। ভদ্র চুপ করিয়া আগাগোড়া সব শুনিলেন। ভঞ্জ যখন বাঙ্গালী মোটর-চালকের মোটরের সামনের কাঁচ ভাঙ্গার কথা বলিল, তখন তিনি একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ভঞ্জ তাঁকে লাল কালিতে লেখা চিঠিটা দেখাইল। একটু হাসিয়া বলিল,

—সোমনাথ বাবু সেয়ানা লোক। তার আরও পরিচয় পাবেন। আমাকে চিঠিটা দিতে চান নি। বল্লেন, আমি নিজে গিয়ে শ্রী ভদ্রকে দিয়ে আসব।

—এরকম সাবধানতা তো ভালোই।

—হাঁ ভালো। কিন্তু যে শত্রু পিছনে লেগেছে, সে ঢের বেশি চালাক।

এই সব কথা শ্রী ভদ্রের কাণে গেল কি না সন্দেহ। তিনি ততক্ষণে তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সেই রক্ত-লেখা টুকরা কাগজটি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর হইতে দেখিয়া ভঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল,

—কি দেখলেন।

শ্রী ভদ্র তাঁর আঙুল গণিয়া গণিয়া বলিতে লাগিলেন,

—শোন ভঞ্জ, মোটর গাড়ির সামনের কাঁচ ধাক্কা লেগে ভাঙ্গে নি। ওটা অন্য মোটরের আরোহী রিভলভারের গুলিতে চুরমার করে দিয়েছে।

ভঞ্জ চমকাইয়া উঠিল।

—কি বলছেন আপনি? কি করে জানলেন?

—ঠিকই বলছি। আর এ নিয়ে যখন আদালত হবে তখন সব জানতে পারবে। চিঠিটা রাস্তাতেই সোমনাথের হাতে যেমন করে হোক পৌঁছে দেওয়ার কথা। কারণ—কারণ—

—কারণ কি?

—কারণ সোমনাথের বাড়ির সামনে আমি অপেক্ষা করছিলাম। সোমনাথ জানেন না।

ভঞ্জ অল্পক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু শ্রী ভদ্রকে সে এত ভালো করিয়া জানে যে, ইহাতে বেশি বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বিস্ময় এইজন্য যে, শত্রু পক্ষ খবর রাখিয়াছিল

শ্রী ভদ্র ঐ সময়ে সোমনাথের বাড়ির কাছে থাকিবেন। কি করিয়া রাখিল তারা ?

ইহার পর, ভঞ্জ, সোমনাথ-গিন্নী তাঁর বাবার অসুখের তার পাইয়া কি রকম অস্থির হইয়াছিলেন এবং পরদিন বাপের বাড়ি রওনা হইয়াছেন, তাও জানাইল।

—তার ? কিসের তার ? আঃ, সোমনাথ বাবুর উচিত ছিল আমার সঙ্গে পরামর্শ করা স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠাবার আগে।

—আপনি কি সন্দেহ করছেন, এর ভিতর কারচুপি আছে ?

—নিশ্চয়।

অবশেষে, সে দিন রাত্রে শ্রী ভদ্র যে সোমনাথকে টেলিফোন করিয়াছিলেন, তা ভঞ্জকে না জানানতে ভঞ্জ তাঁকে একটু অনুযোগ করিল।

—কে টেলিফোন করেছিল ?

—কেন, আপনি।

—কি বলেছিলাম আমি।

ভঞ্জ একটু বিস্মিত হইয়া কথাবার্তাগুলি অবিকল পুনরাবৃত্তি করিল। সব শুনিয়া ভদ্র বলিলেন, সোমনাথকে ধন্যবাদ, তিনি ধরা দেননি। ভঞ্জ, এই টেলিফোনটাই শত্রুদের কাল হবে।

এই বলিয়া তিনি অদূরে স্থিত টেলিফোনের হাতল তুলিয়া লইয়া কানে দিলেন।

—হ্যালো, হ্যালো, হাঁ। লালবাজার পুলিশ কমিশনারকে চাই। বল আমি শ্রী ভদ্র তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অতঃপর শ্রী ভদ্র ও পুলিশ কমিশনারের ইংরেজিতে যে কথাবার্তা হইল তার মর্ম নিম্নরূপ।

—সুপ্রভাত, শ্রী ভদ্র।

—সুপ্রভাত, কমিশনার।

—আমাকে কেন দরকার হল ? আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি, বলুন।

—একটুখানি উপকার আমার করতে হবে। একটা খবর আমায় দিতে হবে।

—সেই ছেলে-চুরির ব্যাপারটা বুঝি ?

—আজ্ঞে হাঁ। আপনারা টেলিফোন আফিস থেকে আমায় জেনে দিন, পরশু রাত ১০টা ৩৩মিঃ-এ অত নম্বরে ফোন হচ্ছিল। কোন্ বাড়ি থেকে ফোন হচ্ছিল এবং সেখানকার ফোনের মালিকের নাম কি আমায় দয়া করে জানিয়ে দিন।

—এই কথা। তা আর বেশি শক্ত কি! আপনাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে জানিয়ে দেব। চুরির কোন কিনারা করতে পারলেন কি ?

—মনে তো হয় পেরেছি। বোধ হয়, দিন দুয়েকের মধ্যে ভদ্রলোক ছেলে ফিরে পাবেন।

—বলেন কি, এত তাড়াতাড়ি। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—ধীরে বন্ধু। ইতিমধ্যে আপনাদের সাহায্য চাই।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। যখন যে সাহায্য দরকার, বলবেন। আমরা একটুও গাফিলি করব না। নমস্কার।

—নমস্কার।

শ্রী ভদ্র বলিলেন,

—ভঞ্জ, আমরা ঢাকা হয়ে মৈমনসিংহ যাব।

—কবে? নূতন দেশ দেখিবার আনন্দে ভঞ্জ লাফাইয়া উঠিল।

—আজ রাত্রে। বলিলেন শ্রী ভদ্র গম্ভীর ভাবে।

আধ ঘণ্টা পরে টেলিফোনের ঘণ্টা ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল। শ্রী ভদ্র বুঝিতে পারিলেন, পুলিশ কমিশনারের আফিস হইতে খবর আসিতেছে। ভঞ্জকে ধরিতে বলিলেন। ফোনে কথাবার্ত্তা কহিবার পর ভঞ্জ যা বলিল, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। ভঞ্জ যে বাড়ির কথা বলিল, তা তাঁর নিজের বাড়ি, এবং ফোনের যে নম্বর দিল, তা তাঁর নিজের ফোনের নম্বর। ভঞ্জ ইহাও বলিল যে, পুলিশ কমিশনার হাসিতে হাসিতে উপহাস করিয়া বলিয়া-

ছেন, শ্রী ভদ্র হুকুম করিলে পুলিশ লইয়া তাঁর বাড়ি চড়াও করা হইবে।

শ্রী ভদ্র বলিলেন,

—ভঞ্জ, খড়্গধারীর দল এবার আমায় সত্যি খুব ঠকিয়েছে। তাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, দুই ভিন্ন বাড়িতে দুই আলাদা লোকের টেলিফোন নং এক হয় কি করে? টেলিফোন এক হওয়ার দরুন না হয় বাড়ির ঠিকানা এক হল।

—হঠাৎ বুঝা কঠিন। কিন্তু এরা অত্যন্ত কৌশলে সকলের অজ্ঞাতসারে কি করেছে জান? কাছাকাছি কোন বাড়িতে এই টালিগঞ্জেই ওদের লোক আছে। সেই বাড়িতে আমার বাড়ি থেকে টেলিফোন এক্স্‌টেনশন নিয়েছে। কাজেই তার নম্বর আর আমার নম্বর এক।

—কিন্তু টেলিফোন কোম্পানি এক্সটেনশন দিতে যাবে কেন? আপনি চিঠি না লিখলে বা না জানালে তারা কাছাকাছি বাড়িতে আপনার টেলিফোন থেকে এক্সটেনশেন দেবে কেন?

—টেলিফোন কোম্পানি দিয়েছে এ তুমি মনে করছ কেন? তারা টেলিফোন কোম্পানিকে না জানিয়ে নিজেরাই এটা করেছে।

—তাহলে আপনার কাছে তো ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

—খুব বেশি দিন নিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তুমি যদি খোঁজ কর, তাহলে সহজেই বাড়িটার সন্ধান পাবে মনে হয়। আমার বিশ্বাস, ওটা একটা খালি বাড়ি। দিনরাত তালাচাবি বন্ধ থাকে। সময় মত চুপি চুপি এসে কেউ ব্যবহার করে। ভাগ্যক্রমে একই সময়ে আমি আর সে ফোন করি নি, নইলে ধরা পড়ে যেত।

—খুব কৌশলী বটে। আচ্ছা তাহলে আপনার আন্দাজী ঘরটা খুঁজে বের করে টেলিফোন কোম্পানিকে এই বে-আইনি কাজের কথা জানিয়ে দি না?

—না, না, তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। আমি চাই কলকাতায় ওদের যদি কোন ডেরা থাকে তা সঠিকভাবে জানতে। আমার চোখে ধূলা দিয়েছে। ভেবেছিলাম, সোমনাথকে টেলিফোন করে নিজের ফাঁদে নিজে জড়িয়ে পড়েছে। আমার সুবিধা হবে। তা নয়। এরা অত্যন্ত চতুর। তাই টেলিফোন করার ব্যাপারেও সাবধান হয়েছে। এদের চতুরতার আর একটা উদাহরণ দি। এরা সোমনাথের মত একশ লোককে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে, ছেলে বা মেয়ে চুরি করার পর। আর এ ভাবে পাঁচ লাখ টাকা জোগাড় করেছে। যারা টাকা দিয়েছে ঠিক কথামত তাদের ছেলে ফিরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন খুন খারাপি করেছে বলে সন্ধান পাই নি। এ সব দল প্রায়ই তা করে।

—সেজন্য ওদের খানিকটা সাধুবাদ করতে হয়।

—হাঁ। তবে এভাবে কতদিন চালাতে পারবে জানি না। কিন্তু এখন যা অবস্থা, তাতে সোমনাথ একটি পয়সাও দেবেন না, অথচ ছেলে ফিরে পাবেন, এ হলেই আমি খুসি। খড়্গধারীর দলের বিরুদ্ধে আমি যতগুলি কেস্ নিয়েছিলাম, সব ফিরিয়ে দিয়েছি।

—কেন?

—সোমনাথ ছাড়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখছি, লোকগুলি অত্যন্ত অর্থপিশাচ। সুতরাং খড়্গধারীরা যদি তাদের খানিকটা রক্তক্ষরণ করে তাহলে তাদের উপকার ছাড়া অপকার হবে না।

দুইজনে হাসিতে লাগিলেন।

ভঞ্জকে সঙ্গে লইয়া শ্রী ভদ্র অপেক্ষমান মোটর গাড়িতে উঠিলেন। তাঁর কোমরের দুই ধারে লুক্কায়িত দুখানা রিভলভার, দুটাই গুলি ভরা। গাড়িতে উঠিয়া হুকুম দিলেন, চিড়িয়াখানা চলো। গাড়ি নক্ষত্রবেগে টালিগঞ্জ হইতে আলিপুরের দিকে ছুটিল।

ভঞ্জ মনে মনে ভাবিল, এই সময়ে চিড়িয়াখানা কেন। কিন্তু যেমন তার স্বভাব, কোন প্রশ্ন করিল না। যে কোন সময়ে চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিবার আদেশ-পত্র তাঁর

ছিল। দ্বার-রক্ষকেরা তাঁকে খুব ভালো করিয়া চিনিত। তিনি দরজায় পৌঁছিতেই সকলে উঠিয়া সেলাম করিল।

—হুজুর অনেক দিন এ দিকে আসেননি। হাস্যমুখে বলিল প্রধান।

—হাঁ। সময় হয়ে উঠে না। বলিলেন শ্রী ভদ্র তাদের হাতে দুটি টাকা দিয়া।

শ্রী ভদ্র সারা পথ আপন মনেই বকিতে বকিতে চলিলেন, ভঞ্জকে কোন কথা বলিবার অবকাশমাত্র দিলেন না। ভঞ্জ বুঝিল, তিনি অতি দ্রুত কোন বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে বাধা দিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন।

সকালবেলার নরম রোদ আসিয়া সর্বত্র পড়িয়াছে। ফাল্গুন। বসন্তের আগমনে প্রকৃতিতে শিহরণ জাগিয়াছে। শীত একেবারে কাটে নাই। ভঞ্জের দিকে একবার তাকাইয়া শ্রী ভদ্র বলিলেন,

—তোমার গরম চাদর আনা উচিত ছিল।

—হাঁ।

সমগ্র বাগানে কেহই ছিল না, দুচার জন ভৃত্য ছাড়া। শ্রী ভদ্র ও ভঞ্জ ইচ্ছামত যেখানে খুশী বেড়াইতে লাগিলেন। বানরদের পাড়ায় আসিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং, হনুমান, বনমানুষ ও ছোট বানর-গুলিকে তিনি বার বার করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

তাদের বার বার দেখিয়াও যেন তাঁর আঁশ মেটে না। তিনি কখনও তাদের ভ্যাংচান, কখনও বা কলা কি অন্য কিছু খাইতে দেন। তাঁর শিশু-সুলভ আচরণ দেখিয়া ভঞ্জ বিস্মিত হইল। মুগ্ধও হইল। যত বড় না ডিটেক্‌টিভ হোন, ভিতরকার মানুষটা তো মরিয়া যায় নাই। সেইটাই আজ ছাড়া পাইয়া জন্তুদের মধ্যে স্বাভাবিক আচরণ করিতেছে। ইহা তাঁকে মানাইতেছে।

এইভাবে বানরদের সাহচর্যে শ্রী ভদ্রের এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। দশটা বাজিল। তখন ভঞ্জ আর থাকতে না পারিয়া বলিল,

—বাড়ি চলুন।

—চল। বলিলেন শ্রী ভদ্র স্বপ্নোত্থিতের মত। তারপর ফিরিবার সময়ও কতবার যে বানরের ঘরগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন!

এর মানে কি? এই প্রশ্ন ভঞ্জ বার বার নিজেকে করিল, কিন্তু কোন সঠিক উত্তর পাইল না। চিড়িয়াখানা হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে চড়িতে যাইবেন, এমন সময় গাড়ির চালক তাঁর হাতে এক চিরকুট আনিয়া দিল। বলিল,

—এটা আমি আমার আসনে পাই।

—কেন, তুমি কি বরাবর গাড়িতে বসে ছিলে না?

জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রী ভদ্র চিরকুটে চোখ বুলাইতে বুলাইতে।

—আজ্ঞে না, আমি গাড়ি থেকে নেমে এই চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছি। মোটরের উপর নজর ছিল। এর মধ্যে কখন যে কে আমার সীটের উপর চিরকুট রেখে গেল, বলতে পারি না।

চালক খুব বিশ্বাসী। সে সত্য কথা বলিতেছে, শ্রী ভদ্র বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন,

—মনে করে দেখ তো আর কেউ সে সময় কাছে ছিল কি না।

—না, ছিল না। শুধু চায়ের দোকানের ভিতরে আলখাল্লা-পরা এক ফকির বসেছিল। মস্ত তার দাড়ি। আর হাতে একটা হাওয়াই বন্দুক।

—হাওয়াই বন্দুক? কি করছিল সেটা দিয়ে?

—কিছু না। মাঝে মাঝে ছুড়ছিল, আর ছুড়বার শব্দ হচ্ছিল।

—হুঁ। বলিলেন শ্রীভদ্র, কিন্তু তাকে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। চিরকুটটা ভদ্রের হাতে দিলেন। অবিকল সোমনাথের চিঠির মতন। ইংরেজি চিঠি। কাল বর্ডার, লাল কালিতে লেখা। চিঠির মর্ম এই:

শ্রী ভদ্র,

আপনি আগাগোড়া আমাদের আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাতে আজ পর্যন্ত অপরাধমূলক কোন কাজ করিতে দেখিয়াছেন কি? সাবধান! আমাদের ঐরূপ কাজে প্রবৃত্ত করাইবেন না। সোমনাথ বাবুকে বলুন, তিনি দয়া করিয়া আমাদের দশ হাজার টাকা দিন ও তাঁর ছেলে ফেরৎ নিন। ছোট ছেলে রাখায় বড় ঝামেলা। দশ হাজার টাকা গেলে তাঁর বিশেষ ক্ষতি হইবে না। ব্যাপারটা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

খড়্গধারী

চিঠি পড়িয়া ভঞ্জের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু শ্রী ভদ্র হাসিতে লাগিলেন,

—ভয় পেয়েছ?

—না। কিন্তু এদের চর-বৃত্তির নিপুণতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

—তা হবারই কথা। বলিলেন শ্রী ভদ্র, চিরকুটটা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে। —হ্যাঁ হে, ভাঁজ করা অবস্থায় পেয়েছিলে, না, গুলি পাকান ছিল?

—গুলি পাকান ছিল।

—বেশ। এখন চল বর্মণ ষ্ট্রীটে, আনন্দবাজার পত্রিকার আফিসে।

ভদ্র ভাবিল, সর্বনাশ! এখন বুঝি আবার সেই পাঞ্জাবী মোটর-চালকের খোঁজ লইবার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু শ্রী ভদ্র সেদিক দিয়া গেলেন না। সেখানকার লোকেরা ডাইনে বাঁয়ে তাঁর পরিচিত। কেহ নমস্কার করে, কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করে। তিনি সোজা গিয়া বিজ্ঞাপন সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হইলেন।

—কি হুকুম হয় বলুন। সম্পাদক স্মিতহাস্যে নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলেন।

—না, বসব না। আজই আপনাদের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বের হওয়া দরকার। জরুরী।

—আজই?

—হাঁ।

সম্পাদক ঘণ্টা টিপিলেন। সহকারী আসিতেই বলিলেন,

—দেখ, শ্রী ভদ্র একটা বিজ্ঞাপন দিতে চান। লিখে নাও।

শ্রী ভদ্র তখন মুখে মুখে বানাইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি ছাপিবার জন্য দিলেন।

"একটি সুশিক্ষিত গরিলা বা বনমানুষ প্রয়োজন। এমন হইবে যে, সে নির্দেশমত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি আছি, পছন্দ

হইলে। আবেদন করুন, বক্স নং ৩২৭, আনন্দবাজার পত্রিকা।

শ্রী ভদ্র বিজ্ঞাপন বাবদ ৫০৲ টাকা দিলেন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া সম্পাদক হাসিয়া বলিলেন,

—শ্রী ভদ্র, এবার এমন অদ্ভুত খেয়াল হল কেন? গরিলা দিয়ে কি হবে?

—দরকার আছে। সংক্ষেপে বলিলেন শ্রী ভদ্র।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করিয়া তিনি ভঞ্জকে লইয়া মোটরে বাড়ির দিকে রওনা হইলেন। যাইতে যাইতে ভঞ্জ বলিল,

—এতক্ষণে আমি কতকটা আন্দাজ করতে পারছি, আপনি অনুসন্ধান কোন দিকে চালাচ্ছেন।

—বেশ, আন্দাজ কর। কিন্তু এখন আমায় কিছু বলবার দরকার নাই। আমাকে একটু ভাববার সময় দাও।

—যে আজ্ঞে।

৯। শিয়ালদহ আদালতে

সমন পাইয়া সোমনাথকে শিয়ালদহের আদালতে আসিতে হইয়াছে। পুলিশ মোকদ্দমা চালাইতেছে পাঞ্জাবী মোটর-চালকের বিরুদ্ধে। সে একজন বড় ব্যারিষ্টার দিয়াছে। এত বড় কৌঁসুলী নিয়োগ করিতে দেখিয়া কোর্টশুদ্ধ লোক আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। পুলিশের পক্ষে কোর্ট ইনস্পেক্টর মোকদ্দমা চালাইতেছেন। সাক্ষী মোড়ের পুলিশ, বাঙ্গালী মোটর-চালক, যেখানে তার

হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়াছিল সেখানকার সেই ডাক্তার, আর সোমনাথ।

যতক্ষণ মোকদ্দমা চলিতেছিল, ততক্ষণ প্রকাণ্ডকায় পাঞ্জাবী মোটর-চালক কাঠগড়ার কাছে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

এগারটার সময় মোকদ্দমার ডাক হইল। হাকিম নড়িয়া চড়িয়া যেন খানিকটা মনোযোগী হইলেন।

প্রথমে মোড়ের পুলিশ আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। সে শপথ-গ্রহণ করিলে পর কোর্ট ইনস্পেক্টর তার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর প্রশ্ন হইল।

—(পাঞ্জাবী মোটর-চালককে দেখাইয়া) তুমি এঁকে চেন ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তুমি দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কি জান বল।

—মৌলালির মোড়ে আমি যানবাহন রুখতে হাত দেখাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা মোটর গাড়ি সার্কুলার রোড দিয়ে আসছিল, আর একটা গাড়ি ধর্মতলা দিয়ে ছুটে এসে তার উপর পড়ল। শেষের গাড়ি চালাচ্ছিল এই লোক (সনাক্ত করিল)।

—তখন সময় কত ?

—রাত্রি ৯টা বেজে ১৪ মিনিট।

—যে গাড়ির উপর এসে পড়ল তার চালককে জান ?

—আজ্ঞে হাঁ (দেখাইয়া দিল)।

—তারপর কি হল ?

—তারপর দেখলাম বসবার উল্টা দিকে সামনের ছোট কাঁচ ভেঙ্গে গেছে। আর এই লোকটির হাত কেটে রক্ত পড়ছে।

—কাঁচে ?

—হাঁ।

—তুমি প্রাথমিক চিকিৎসা করলে না ?

—সামনেই ডাক্তারখানা ছিল। নিয়ে গেলাম। তারা হাত বেঁধে দিলে।

এই সময় কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার হাকিমের কাছে ডাক্তারের একটা সার্টিফিকেট দাখিল করিতেই ব্যারিষ্টার সাহেব তাঁকে ধমকাইয়া উঠিলেন,

—রাখুন, মশায়, রাখুন। ওটা দেবেন না।

—কেন ?

—ওটা জাল।

—এই কথা। আমি প্রমাণ করব, জাল নয়। ডাক্তার বাবু উপস্থিত আছেন।

হাকিম ব্যারিষ্টারের আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন।

কোর্ট ইনস্পেক্টার পুলিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—তুমি কি দেখলে ধাক্কা দিবার পর ঐ মোটর গাড়ি পালাতে চেষ্টা করছে ?

—না।

—তাই তুমি নম্বর টুকে নিতে পারলে?

—হাঁ।

—তোমার কি মনে হয়, পাঞ্জাবী মোটর-চালক ইচ্ছা করে ধাক্কা লাগিয়েছিল?

—আমার তাই মনে হয়। সে যেন ওর উপর পড়বে বলেই আসছিল।

—তারপর কি দুজনে কথা কাটাকাটি হল?

—পাঞ্জাবী মোটর-চালকটি অশ্রাব্য গালাগালি দেওয়াতে আমি শাসন করি।

ব্যারিষ্টার সাহেব জেরা করিতে উঠিয়া অনেক আজে বাজে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্তমান মোকদ্দমার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ। ব্যারিষ্টার বলিলেন, আমি প্রমাণ করতে চাই যে, আগে থেকেই বাঙ্গালী ড্রাইভারটির সঙ্গে পুলিশের ভাব ছিল। সে ঘুষ খেয়ে এই কেস্ এনেছে।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কাঁচ ভাঙ্গল কি করে?

—স্যার, দিনে ওদের দুশ বার করে কাঁচ ভাঙ্গে। সেটা শক্ত কথা নয়। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিলেন ব্যারিষ্টার।

হাকিম প্রশ্নগুলি অবান্তর বলিয়া না-মঞ্জুর করিলেন।

ইহার পর ডাক্তার আসিয়া প্রমাণ করিলেন, সার্টিফিকেট জাল নয়, সত্য। আর সাক্ষীর যে হাত কাটিয়া গিয়াছিল এবং তিনি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াছিলেন, তাও সত্য। কাটাটা কাঁচের কাটা হওয়ার সম্ভাবনা, তবে তিনি নিজে দুর্ঘটনা দেখেন নাই। যার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াছিলেন, সেই মোটর-চালক তাঁর অপরিচিত। কি কি ঔষধ দিয়াছেন, তাও বলিলেন। ব্যারিষ্টারের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, পড়িয়া গিয়া বা ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া ঐরূপ আঘাত ও রক্তপাত হইতে পারে না।

বাঙ্গালী মোটর-চালক তার সাক্ষ্যে বলিল যে, সে সোয়ারি লইয়া সার্কুলার রোড ধরিয়া আসিতেছিল। তারপর কোথায় কি ভাবে দুর্ঘটনা হয়, এবং সে কি করিয়া তার গাড়ি ও সোয়ারিকে বাঁচায়, তা বিশদ-ভাবে বলিল। তার হাতের কোন্ জায়গা কাটিয়াছিল, আর সে কোন্ ডাক্তারের কাছে গিয়াছিল, বলিল। শেষে এই কথা যোগ করিয়া দিল যে, ভাগ্যে তার মোটর চালাইবার অভিজ্ঞতা অনেক দিনের, নইলে গাড়ি-খানা বাঁচান যাইত না, আরোহীরও প্রাণ-সংশয় হইত।

ব্যারিষ্টার কঠিনভাবে তার জেরা সুরু করিলেন।

—তুমি সোয়ারি নিয়েছিলে কোথায়?

—বর্মন ষ্ট্রীটে।

—কেন?

—কাছেই আমি গাড়ি রাখি।

—তোমার সোয়ারি যাঁকে বলছ, তিনি তো পাঞ্জাবীর মোটর গাড়ি নেবার জন্য যাচ্ছিলেন। মাঝখান থেকে তুমি জোর করে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে কেন?

—না, আমি ছিনিয়ে নেই নি। উনি নিজে আমার গাড়ি বেছে নিয়েছেন, তার আমি কি করব?

কোর্ট ইনস্পেক্টার হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

—হুজুর, ড্রাইভাররা আরোহী পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই থাকে। কথাটা অবান্তর। এর দ্বারা বিপক্ষের মাননীয় ব্যারিষ্টার মশায় কি প্রমাণ করতে চান?

—এই কথা যে, মোটর গাড়ি বে-আইনি দ্রুতভাবে যে চালিয়েছিল সে হচ্ছে বাঙ্গালী চালক, পাঞ্জাবী চালক নয়। পাঞ্জাবীর উপর বাঙ্গালীর একটা বিদ্বেষ ভাব বরাবর আছে।

আদালত শুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল। কেহ কেহ মন্তব্য করিল,

—বাঙ্গালী হয়ে এতটা পাঞ্জাবী-প্রীতি তো সুবিধার লক্ষণ নয়।

হাকিম বলিলেন,

—তারপর?

ব্যারিষ্টার বলিলেন,

—তোমার আরোহী আনন্দবাজার আফিসে গিয়েছিলেন ?

—আমি তা জানি না।

—তিনি একটা বন্ধ মোটর গাড়িতে সেখানে আসেন। তারপর সেটা চলে গেলে মোটর গাড়ির খোঁজে যান।

—আমি জানি না।

—বর্তমান মোকদ্দমার সঙ্গে আপনার এই সব প্রশ্নের কি সম্পর্ক, আমি তা ঠিক বুঝতে পারছি না। কলম রাখিয়া দিয়া হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন।

—এখনই বুঝতে পারবেন স্যার, আমাকে যদি দু মিনিট সময় দেন। বলিলেন ব্যারিষ্টার সাহেব।

—আচ্ছা।

—তুমি তোমার সোয়ারি নিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে উত্তর মুখে ছুটতে ছুটতে ঘুরে দক্ষিণ মুখে ছুটতে লাগলে কেন ? জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যারিষ্টার সাহেব বাঙ্গালী চালককে।

—আমার সোয়ারির হুকুম মত।

—কেন হুকুম দিলেন ?

—জানি না।

—জানো না ? আমি বলছি, তুমি জানো। তুমি পাঞ্জাবীর গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগাবার জন্য তার পিছনে দৌড়েছ ও চেষ্টা করেছ।

—না।

হাকিম বলিলেন,

—আপনার অন্য প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, কিন্তু এ ধরণের প্রশ্ন আর করতে দেব না।

—ওকে আর আমার প্রশ্ন নাই।

ইহার পর সোমনাথের ডাক হইল। তিনি প্রথমত কোর্ট ইনস্পেক্টারের প্রশ্নের উত্তরে আনুপূর্বিক সকল ঘটনা বর্ণনা করিলেন। জেরায় তিনি স্বীকার করিলেন, তিনি আনন্দবাজার আফিসে বন্ধ গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, পাঞ্জাবী চালকের গাড়ি ইচ্ছা করিয়া লন নাই, ইহার পর লোকটা কেন তাকে অনুসরণ করিয়াছে, তিনি বলিতে পারেন না, বাঙ্গালী চালক কৌশলে গাড়ি না বাঁচাইলে উহা চুরমার হইয়া যাইত। শ্রী ভদ্রের নির্দেশ অনুসারে তিনি খড়্গধারীর পত্রের কথা উল্লেখ করিলেন না। কিন্তু কি ভাবে কাঁচ ভাঙ্গিয়াছিল, তা হুবহু বর্ণনা করিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব তাঁকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ভাবে তাঁকে আক্রমণ করায় পাঞ্জাবী চালকের কি স্বার্থ থাকিতে পারে, তিনি প্রতিবারই উত্তরে বলিলেন, তা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁর নাই।

ব্যারিষ্টারের জেরার উত্তরে সোমনাথ স্বীকার করিলেন, তিনি আনন্দবাজার আফিসে আসিয়া মোটর গাড়ি ধরিয়াছিলেন।

—বন্ধ গাড়ি কার ?

—বলব না।

—বন্ধ গাড়ি করে কোথা থেকে আসছিলেন ?

—বলব না।

হাকিম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,

—বন্ধ গাড়িতেই আসুন আর আনন্দবাজার আফিসেই আসুন, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আচ্ছা সোমনাথ বাবু, আপনার জানা বা অজানা কোন শত্রু আপনার পিছন নিয়েছিল ?

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,

—ঠিক বলতে পারি না। তবে আমার গাড়ির কাঁচের জানালা ভাঙ্গা উদ্দেশ্য ছিল।

—কেন ?

সোমনাথ নিরুত্তর রহিলেন।

হাকিম পুনরপি বলিলেন,

—রেষারেষি করে পাঞ্জাবী চালক ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক বাঙ্গালী চালককে ধাক্কা দিয়েছিল, কল্পনা করতে পারি। কিন্তু সে অবস্থায় লক্ষ্য হবে চালক, আপনি নন। আপনি কেন মনে করছেন, আপনিই লক্ষ্যস্থল।

সোমনাথ উকীল মানুষ। চট করিয়া মাথায় একটা ওকালতি বুদ্ধি আসিল। বলিলেন,

—আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি না আমি লক্ষ্যস্থল

কি না। তবে বাঙ্গালী মোটর-চালকের উপর পাঞ্জাবীটির রাগ বোঝা যায়, যখন নিজেই ধাক্কা দিয়ে আস্তিন গুটিয়ে মারতে এল ও গালাগালি করল।

হাকিম সোমনাথকে বিদায় দিলেন।

হাকিম রায় লিখিতে যাইবেন, এমন সময় একজন কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুলিশ ডাক্তার উঠিয়া বলিলেন,

—হুজুর, আমার একটু বক্তব্য আছে।

হাকিম বিস্ময়ে কলম রাখিয়া তাঁর দিকে চাহিলেন

—কি ?

—আপনাকে কষ্ট করে একটু উঠে মোটরখানার অবস্থা দেখতে হবে।

—তাতে নূতন কথা আর কি প্রমাণ হবে। হাকিম কলম তুলিয়া লইলেন।

—আমি বলছি হবে।

কৌতূহলী হইয়া হাকিম, কৌঁসুলীরা ও আরও অনেকে উঠানে আসিলেন, যেখানে কাঁচ-ভাঙ্গা অবস্থায় গাড়িটা পড়িয়া আছে। পুলিশ-ডাক্তার একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র বাহির করিয়া ভাঙ্গা কাঁচের উপর লাগাইয়া দেখাইলেন স্পষ্ট গুলির চিহ্ন। তিনি বলিলেন,

—স্পষ্ট গুলির চিহ্ন।

হাকিমের মুখ খুব গম্ভীর হইল। তিনি ব্যারিষ্টারের

দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে গুলি করেছিল? দাগ আজকের নয়।

ব্যারিষ্টার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না।

পাঞ্জাবী চালকের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

১০। চোর ধরা পড়িল

সকাল বেলা। ভঞ্জকে লইয়া শ্রী ভদ্র ঢাকা ঘুরিয়া মৈমনসিংহ বেড়াইয়া আসিয়াছেন। সেই বিষয় লইয়াই দুজনে কথাবার্তা হইতেছিল। শ্রী ভদ্রের মুখ গম্ভীর। ভঞ্জ কিন্তু উৎফুল্ল। ভঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল,

—আপনাকে খুসী দেখছি না কেন।

—আমার মনে হচ্ছে, আসল ছেলে-চোর ধরা পড়বে না।

—এর আবার আসল নকল আছে না কি?

—আছে। পরে বুঝতে পারবে।

এমন সময় দাসী আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রী ভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কি?

দাসী তাঁর হাতে একটি ময়লা বিজ্ঞাপনের টুকরা দিল। এটা তাঁর দেওয়া আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে কাটা, গরিলা বা বনমানুষের জন্ত বিজ্ঞাপন। দাসী

জানাইল একজন বলিষ্ঠ প্রৌঢ় মুসলমান তাঁর সহিত দেখা করিতে চায়। তিনি আসিতে আজ্ঞা দিলেন। দাসী পিছন ফিরিবামাত্র ভঞ্জকে চুপি চুপি বলিলেন,

—রিভলভারটির উপর গোপনে হাত রেখে স্থির হয়ে বসে থাক। দরকার হলে চোখের নিমেষে গুলি করবে, দ্বিধা করবে না।

উৎসাহে ও উত্তেজনায় ভঞ্জ বিপরীত দিকের চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল। দাসী তার কথিত ব্যক্তিটিকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

লম্বা শক্ত সমর্থ চেহারার এক মুসলমান প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিল। বয়স ষাট পার হইয়াছে। পাকা দাড়ি, বুক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। মুখটা মস্ত ও হিংস্র। হাতের পেশি দেখা যাইতেছে। ভাবটা নির্ভীক। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় আগন্তুক বলিল,

—বাবুজি, আপনি বনমানুষ বা গরিলা চেয়েছেন। কি উদ্দেশ্যে?

শ্রী ভদ্র হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমার দরকার, তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছি। কেন চাই, তা কি আমি বলতে বাধ্য?

—না, বাধ্য নন। কিন্তু আপনার কোন্ কাজে লাগবে জানলে উপযোগী জানোয়ার আপনাকে দিতাম।

—তোমার কাছে হরেক রকম জানোয়ার আছে না কি ?

—জি।

—তোমার ঠিকানাটা কি ?

—মাপ করবেন, আমার কোন ঠিকানা নাই।

—তার মানে ?

—তার মানে আমি আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে বেড়াই। বুঝতেই তো পারছেন আমাদের জিনিষ বিক্রী কদাচিৎ হয়, তাই দেশে দেশে আমাদের না ঘুরে বেড়ালে চলে না।

—ও।

—এখন বলুন, কেন আপনার জানোয়ার চাই।

—যদি বলি, আমার খেয়াল।

—তাহলে বিশ্বাস করব না, আর দেবও না।

—তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন কতকগুলি। আমি বেছে নিতাম।

—সে অনেক হাঙ্গামা। আপনার কাছে শুনে বুঝতে পারব কি ধরণের জীব আপনার দরকার। সেই অনুসারে বেছে গুটি দুই তিন নিয়ে আসব।

—তবে বলি শুন। আমার এমন বনমানুষের দরকার, যে আমার কথা বুঝতে পারবে। তাকে যদি বলি

অমুককে নিয়ে এস, নিয়ে আসবে। যদি বলি, অমুকের ছেলে চুরি কর, চুরি করে এনে দেবে।

আগন্তুকের কোন চমকাইবার লক্ষণ দেখা গেল কি ? ভক্ত পরে বলিয়াছে, সে স্পষ্ট দেখিয়াছিল শ্রী ভদ্রের কথায় সে চমকাইয়া যায়। শ্রী ভদ্র নিঃসন্দেহ নন। তবে শ্রী ভদ্রের কথা শুনিয়া সে প্রায় এক মিনিট চুপ করিয়া রহিল। চারিদিকে একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া বলিল,

—অদ্ভুত কথা।

—কেন, অদ্ভুত কিসে ?

—বনমানুষ বা গরিলাকে দিয়ে কেউ কি এমন কাজ করায় ?

—আচ্ছা, বেপারীজি, সত্যি করে বল দেখি এ বছর তোমার গরিলা বা বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জি কয়টা বিক্রি হয়েছে ?

—একটা।

—কত টাকা পেয়েছ ?

—হাজার।

—কে নিয়েছে ?

—বাবুজি, আমাদের কাছে কে কখন জানোয়ার কেনে, তার তো কোন পাত্তা রাখি না।

—আমি তোমায় যে রকম জন্তু দিতে বল্লাম, পারবে দিতে ?

—পারব।

—কবে দেবে?

—পরশু।

—কথা রইল, তুমি এই সময়ে জানোয়ার নিয়ে আসবে আর আমি তোমায় টাকা গুণে দেব।

—জি।

শ্রী ভদ্র ঘণ্টা টিপিলেন। দাসী আসিয়া সেই মুসলমান বেপারীকে বাহিরে লইয়া গেল।

শ্রী ভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কি বুঝলে?

ভঞ্জ নিরাশ হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, খুব একটা ক্ষিপ্র সাহস দেখাইবার সুযোগ জুটিবে। তার কিছুই হইল না। লোকটা বেচালের লক্ষণ মাত্র দেখাইল না। ভঞ্জ বলিল,

—মিছেই আমাকে রিভলভার নিয়ে তৈরী থাকতে বলেছিলেন।

—মিছে বলিনি একটুও। লোকটা অত্যন্ত চালাক। বুঝেছে, আমরা এখানে অতি-প্রস্তুত। সে একটু ইদিক-উদিক করলে আমাদের হাতে মারা পড়বে। তাই মানে মানে চলে গেল, কোন রকম টুঁ শব্দটি করল না।

—হুঁ।

—কি জন্য এসেছিল বল দেখি।

—বিজ্ঞাপন মত মাল যোগাতে নিশ্চয় নয়, এটা বুঝেছি।

—ঠিকই বুঝেছ। আমাদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে জানতে এসেছিল, কোনখানে ফাঁক আছে কি না।

—আপনি জেনেশুনেও ওকে ঢুকতে দিলেন কেন?

—ক্ষতি কি। ও আমাদের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল। যথাযথ রিপোর্ট পাবে ওর কর্তা। আমার সঙ্গে লড়াই করবার আগে তিনবার ভাববে।

—ও কর্তা নয়?

—মোটেই না। দুঃখ এই, পিছনের আসল লোকটিকে কিছুতেই ধরতে পারছি না। সে আমাকে বার বার ভোগা দিয়ে পালাচ্ছে। পাঞ্জাবী চালক জেলে গেল। এটাও রেহাই পাবে না।

—সে কি?

—আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতে না যেতে পুলিশ ওকে ধরবে সে বন্দোবস্ত করে রেখেছি। কিন্তু আসল লোকটির কিনারা পাচ্ছি না। যাক্, আর সময় নষ্ট করা যায় না। সোমনাথ বাবুর ছেলেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। সেটা আরও দরকারী কথা। তাতে এ যাত্রা যদি খড়্গধারী বেঁচে যায় তো যাক্।

বলিতে বলিতে শ্রী ভদ্র অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। ভক্ত জানে এ সময় তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলিয়া লাভ নাই।

ঘণ্টা দুই পরে শ্রী ভদ্র ও পুলিশ কমিশনারের নিম্ন-লিখিত কথাবার্তা হইল।

—হ্যালো, আমি শ্রী ভদ্র।

—সুপ্রভাত, শ্রী ভদ্র।

—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। আপনার সাহায্য চাই যে।

—কিসের জন্য?

—সোমনাথ বাবুকে মনে আছে?

—হাঁ, হাঁ, যাঁর ছেলে হারিয়েছিল। তাঁর কি আবার নূতন কোন বিপদ হয়েছে?

—না, নূতন বিপদ হয় নি। তবে আমার কথামত আজই তাঁর ছেলেকে তাঁর পত্নীর হাতে দেবার কথা।

—বাই জোভ্, আপনি সন্ধান পেলেন?

—আসল ছেলে-চোরকে আজও ধরতে পারিনি। তবে ছেলে আমি আনব।

—বলুন, বলুন, কি সাহায্য আমি করব।

—বেশি কিছু না। টালিগঞ্জের অমুক রাস্তার ১৩ নম্বর বাড়ি একটা পড়ো বাড়ি। সেই বাড়িটা পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করবেন এবং পুলিশের কর্মচারীকে বলবেন, তিনি যেন দয়া করে আমার নির্দেশ মত চলেন।

—আচ্ছা। চোরটি কে?

—যখন ধরা পড়বে, দেখতে পাবেন। দুঃখের বিষয়, যে ধরা পড়বে সে নকল চোর, আসল চোর নয়।

—সে কি।

—আসল চোর ধরতে গেলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই এ যাত্রা তাকে রেহাই দিচ্ছি। তাকে আমি ছাড়ব না নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যে সোমনাথ বাবুর ছেলেকে উদ্ধার না করলে আপনার ও আমার সম্ভ্রম থাকে না।

ওপারে পুলিশ সাহেবের হাসি শোনা গেল। তাহলে শ্রী ভদ্রের মত বিখ্যাত ডিটেকটিভকে বুদ্ধিতে হার মানাবার মত লোকও আছে।

—আপাতত।

খড়্গধারীদের দেওয়া পনের দিনের মধ্যে চৌদ্দ দিন অতীত হইয়াছে। দিন দুই হইল সোমনাথ-গিন্নী পাটনা হইতে নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। খড়্গধারীরা কয়েক দিন খুব চুপচাপ আছে। যেন তারা আন্দাজ করিয়াছে তাদের ধরিবার জন্য আয়োজন হইতেছে, তাই নিঃশব্দ হইয়া আছে। সোমনাথ-গিন্নী বলিলেন,

—আর মোটে তো একটা দিন আছে। টাকাটা দিয়ে ফেল, ছেলে বুকে তুলে নি। টাকা না পেয়ে ছেলেকে যদি ওরা কেটেই ফেলে তাহলে আমরা কি করতে পারি?

স্ত্রীকে সাহস দিয়া সোমনাথ বলিলেন, অত ভয় পাচ্ছ

কেন ? শ্রী ভদ্র যখন ব্যাপারটা হাতে নিয়েছেন, সমস্ত বুঝেই তো নিয়েছেন। তিনি বললে আমি টাকা রেখে আসতে ইতস্তত করব না।

এমন সময় বাহিরের কড়া নড়িয়া উঠিল। রামধন ছুটিয়া দেখিতে গেল, কে আসিয়াছে। ভঞ্জকে দেখিয়া বলিল, আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

সোমনাথ নিচে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কি খবর ?

পিছনে পিছনে সোমনাথ-গিন্নীও নামিয়া আসিয়াছিলেন। ভঞ্জ বলিল,

—শ্রী ভদ্র আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন। এতে সব বুঝতে পারবেন। তিনি টেলিফোনে আপনাকে বলতে পারতেন, কিন্তু টেলিফোন নিরাপদ নয়।

দ্রুতহস্তে খাম ছিঁড়িয়া সোমনাথ শ্রী ভদ্রের চিঠি পড়িলেন। তাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল।

আপনার মনে আছে আপনি ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একটি কৃষ্ণবর্ণ খামের চিঠি পান। তাতে লেখা ছিল, অমুক রাস্তার ১৩নং বাড়ীর দোতলার বারান্দায় একটা সিন্ধুকে দশ হাজার টাকা রাখিয়া দিলে আপনি আপনার ছেলে ফিরিয়া পাইবেন। ঐ চিঠির তারিখের পর আজ চৌদ্দ দিন চলিতেছে। আপনি আজ সারাদিনের মধ্যে দশ হাজারটি এক টাকার নোট ব্যাঙ্ক

হইতে জোগাড় করিবেন, তারপর একটা থলিয়ার মধ্যে সেগুলি পূরিয়া গালা দিয়া তার মুখ আঁটিয়া দিবেন। ঐ টাকা আপনি কাল সকাল ৮টার মধ্যে ঐ বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন। সে বাড়ী খালি থাকে তো উত্তম। আর খালি না থাকিলে কারও সহিত কোন বাক্যালাপ করিবেন না, সিন্ধুকের মধ্যে টাকার থলি রাখিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিবেন। ভয় পাইবেন না। আপনার নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য কলিকাতার পুলিশ ও আমি দায়ী রহিলাম।

এই চিঠি পড়িয়া সোমনাথ চমৎকৃত হইলেন। সেই টাকাই যদি দিতে হইল, তা হইলে এত দেরী করিবার কি দরকার ছিল? বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধির খেলায় শ্রী ভদ্র পরাজিত হইয়াছেন। আশা করিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত জয়ী হইবেন, হইতে পারিলেন না। তাই সোমনাথকে এই পরামর্শ দিয়াছেন। ভালো, উপায় যখন নাই, তাই করা যাইবে।

সোমনাথের চিঠি পড়া শেষ হইতেই ভঞ্জ বলিল,

—এখন তাহলে আমি আসি। বলিয়া চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া আর তাকে দেখা গেল না।

সোমনাথ তখন চিঠিটা স্ত্রীর হাতে দিলেন। সোমনাথ-গিন্নী আগাগোড়া সব পড়িয়া বলিলেন,

—একটু আগেই না তোমায় বলছিলাম, টাকা দিতে। শ্রী ভদ্রও তো তাই বলেছেন।

—হাঁ।

—তাহলে আর দ্বিরুক্তি করে কি হবে। যেখানে শ্রী ভদ্র হেরে গেলেন, সেখানে আর কে কি করবে?

সোমনাথ তর্ক করিবার জন্য বলিলেন,

—এটা হার নাও তো হতে পারে।

—তবে কি?

—এর মধ্যে চোর ধরবার উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

বলিলেন বটে, কিন্তু নিজের মনে বিশ্বাস ছিল না। তিনি দশ হাজারটি এক টাকার নোট জোগাড করিয়া একটা থলিতে বন্ধ করিলেন ও শীল লাগাইলেন।

সে-রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীর নিদ্রা হইল না। আর একজন সারারাত্রি জাগিয়া রহিল। সে হইতেছে, রামধন।

পরদিন সকাল ৮টা বাজিবার আগেই সোমনাথ মোটরে করিয়া নির্দিষ্ট রাস্তার ১৩নং বাড়ির কাছে নামিলেন। মস্ত বাড়ি। গা ছম্ ছম্ করে। কিন্তু তাঁর মনে হইল বাড়ি যেন খালি নয়। অথচ কাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। শীত করিতে লাগিল। গরম জামা পরিয়া আসিয়াছিলেন। বোতাম আঁটিয়া দিলেন। এই জনমানবশূন্য বাড়িতে কেহ যদি তাঁকে খুন করিয়া ফেলে তা হইলে রক্ষা করিবার কেহ নাই। আচ্ছা, সমস্তটাই

যদি তাঁকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা হয়! একবার তো ভুলাইয়া ওরা তাঁর স্ত্রীকে পাটনা পাঠাইয়াছিল। 'যে আসিয়াছিল সে যে সত্যই ভক্ত এবং চিঠিখানা শ্রী ভদ্রের লিখিত তার প্রমাণ কি। এই সব ভাবিতে ভাবিতে তিনি দোতলায় উঠিলেন। দেখিলেন, পূবের বারান্দায় সত্যই একটা সিন্দুক পড়িয়া আছে। তার ডালা ধরিয়া টানিতেই খুলিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি টাকার থলিটা তার ভিতরে রাখিয়া তালা পূর্ববৎ আটকাইতেই চারিদিকে একটা পৈশাচিক হাসির ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁর শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। তিনি চোখ মুদিয়া দ্রুত দৌড়াইয়া নিচে নামিয়া আসিলেন এবং মোটরে চড়িয়া বলিলেন, জলদি হাঁকাও। তাঁর আর পিছন ফিরিয়া দেখিবার সাহস রহিল না। তবে তাঁর যেন মনে হইল, জলে স্থলে হুলুস্থুল বাধিয়া গিয়াছে। পুলিশী বাঁশীর ঘন ঘন ফুৎকার, ধ্বস্তাধ্বস্তি, হুড়াহুড়ি, বহু পদক্ষেপ, চীৎকার এই সব যেন তিনি পিছনে ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁর মনে হইল এ কি মায়া না মতিভ্রম? তাঁর গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। তাঁর গাড়ির চালকের অবস্থা তাঁর চেয়ে ভালো নয়।

বাড়ি ফিরিয়া দেখেন, মহোল্লাস পড়িয়া গিয়াছে। খোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন

করিয়া দিতেছেন তার মা, আর সে অবাক্ নয়নে তাকাইয়া আছে। সোমনাথ-গিন্নী বার বার বলিতেছেন, বাছা আমায় ভুলে গেছিস্, আর হুকুম করিতেছেন দুধ আন, জল আন ইত্যাদি। রামধন কখনও হাসিয়া কখনও কাঁদিয়া নাচিতে নাচিতে হুকুম তামিল করিতেছে।

বহু দিন পরে সোমনাথের মুখে অকপট হাসি দেখা দিল। দশ হাজার টাকা গেছে, তার জন্য আপশোষ মিটিয়া গেল। খুব খাটিয়া এক বছরে দশ হাজার টাকা উপার্জন করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলে দিয়ে গেল কে?

রামধন বলিল, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। দুয়ারে করাঘাত শুনিয়া দুয়ার খুলিয়া দেখে, প্রকাণ্ড একটা গরিলা ছেলে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রামধন থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাকে দেখিবামাত্র আলগোছে তার হাতে ছেলে গছাইয়া দিয়া কোথায় যে দৌড় মারিল, রামধন তা বুঝিতে পারিল না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইল, তাড়াতাড়ি আসিয়া মার কোলে ছেলে ফেলিয়া দিয়াছে।

এমন অবিশ্বাস্য গল্প বিশ্বাস করা সোমনাথ ও তাঁর স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা ধরিয়া লইলেন, রামধন কি দেখিতে কি দেখিয়াছে, কে জানে।

এই আনন্দের মধ্যে এক ঘণ্টাও কাটে নাই। এমন

সময় সোমনাথের বাড়ির চারিদিকে পুলিশের বাঁশী বাজিয়া উঠিল ও মার্চ শোনা গেল। দরজা খুলিয়া দিতেই এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়িল। তা দেখিবার জন্য সোমনাথের অন্য পরিজন ও অনুচরেরা আসিয়া জুটিল। দেখা গেল, প্রকাণ্ড একটা বনমানুষকে হাতে পায়ে শিকল বাঁধিয়া খাঁচার ভিতর রাখা হইয়াছে এবং খাঁচাটা টানিয়া আনা হইতেছে। সে ভয়ানক চীৎকার করিয়া আপত্তি জানাইতেছে বটে, কিন্তু তা শোনা হইতেছে না। চারিজন পুলিশ খাঁচার চারিদিকে। শ্রী ভদ্র বলিলেন,

—সোমনাথবাবু, এই আপনাদের ছেলে-চোর।

সোমনাথ ও তাঁর স্ত্রী বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন।

শ্রী ভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

—ছেলে পেয়েছেন তো ?

—হাঁ।

—কি ভাবে পেলেন।

সোমনাথ সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। শ্রী ভদ্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন,

—ঠিক ঠিক, আমিও তাই ভেবেছি।

এতক্ষণে পুলিশ কমিশনার আসিয়া পড়িলেন। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,

—শ্রী ভদ্র, ভদ্র আমি আপনাদের অভিবাদন্ জানাচ্ছি। ধন্য বুদ্ধি আর সাহস!

শ্রী ভদ্র বলিলেন,

—না, এখন নয়। আসল চোর ধরি আগে, তারপর।

শ্রীভদ্র শীল করা টাকার থলিটা সোমনাথ-গিন্নীর হাতে দিলেন। তিনি বিস্ময়ে ও লজ্জায় হতবাক্ হইয়া রহিলেন।

১১। শেষ কথা

সোমনাথের বৈঠকখানায় সকলে আসিয়া শ্রী ভদ্রের চারিদিকে গোল হইয়া বসিলেন। যে দারোগা বামধনকে চোর ধরিয়াছিলেন, তাঁকে পূর্বাহ্ণে খবর দিয়া ডাকিয়া আনা হইয়াছে। স্বয়ং পুলিশ সাহেবকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁর বুক ঢুরু ঢুরু করিতেছে। শ্রী ভদ্র কি করিয়া চোর ধরিলেন, তা জানিবার জন্য সকলের মনে অদম্য কৌতূহল। তা চারিতার্থ করিবার জন্য শ্রী ভদ্র তাঁর ব্যাখ্যা বিবৃত করিতেছেন। চা, চুরুট, স্যাণ্ডউইচ ও ডিম চলিতেছে।

শ্রী ভদ্র ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,

—সোমনাথ বাবু, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, একদিন আপনার স্ত্রীকে, মহিমময়ী নারীকে

দেখে চোখ সার্থক করব। না, না, আপনাকে অত লজ্জায় মাথা নিচু করতে হবে না। আমি ঠিকই বলছি। আচ্ছা পুলিশ কমিশনার, আপনিই বলুন, যে নারী তাঁর পুরাতন ভৃত্যকে ছেলে-চুরির অপরাধে দোষী জানলেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত, দারোগার শত অনুরোধেও তাকে অবিশ্বাস করেন না, তাঁকে আর অন্য কোন নামে ডাকতে পারি কি ?

পুলিশ কমিশনার সায় দিয়া বলিলেন,

—তা বটেই তো।

—আমি আনন্দিত যে, আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছি। আমি আরও আনন্দিত যে, আপনার ছেলেকে আপনাদের কোলে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি এবং সোমনাথ বাবুর দশ হাজার টাকা থেকে একটা কাণাকড়িও খরচ হয় নি।

ভঞ্জ, আমার কায-প্রণালী তুমি জান। আর তুমিই সব চেয়ে উৎসুক হয়ে রয়েছ, আমার মুখ থেকে শুনবার। নয় কি ? সংক্ষেপে সব বুঝিয়ে বলি শোন।

সোমনাথ বাবু, আপনার নিশ্চয় মনে আছে রাত্রি একটার সময় মৈমনসিংহে আপনি ঢাকা-গামী গাড়ি পেয়েছিলেন। পেয়ে আপনারা কি করলেন ? দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা বন্ধ ছিল, আপনারা খোলালেন। এইটি লক্ষ্য করবেন। গাড়ির কামরা একবার খোলালে

চলন্ত অবস্থায় তা আর বন্ধ হতে পারে না। অপর ওটা যে চলবার আগে পর্যন্ত খোলা ছিল, তার প্রমাণ সোমনাথ যখন রামধনকে টেনে ওঠালেন ও তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠালেন, তখনও খোলা ছিল, নইলে সে নেমে গেল কি করে? সোমনাথ বাবু, আপনি যেটাকে নিজের বাতিক বলেছেন, টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা, সেইটাই আমার মস্ত সাহায্য করেছে। আপনি ভিজা গাড়িতে অনেকগুলি বড় বড় পায়ের দাগ দেখে ভয় পেয়েছিলেন। এগুলি আমাকে অত্যন্ত ভাবিয়েছিল এবং ধরতেই পারছিলাম না, ঐ দাগগুলি কোথা থেকে এল? আপনার মনেও অনুরূপ সন্দেহ জেগেছিল। একবার মনে হয়েছিল কোন দস্যু দল রণ-পা ব্যবহার করে হয়তো এসেছিল। কিন্তু যে অবস্থায় ছেলে চুরি যায়, তাতে তারা না হয় পায়ের দাগ রেখে গেল, কিন্তু ছেলে চুরি করবার সুযোগ পেল কখন? তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলল, ছেলে-চুরি ঠিক কোন সময়ে হয়েছে। রামধন বলছে, সে খোকাকে কম্বল জড়ান অবস্থায় ঘুমাতে দেখেছিল। তার চোখের কি এত ভুল হওয়া সম্ভব যে, কম্বল-চাপা অবস্থায় সে না দেখেও ভেবেছে খোকা আছে? তারপর কামরার ভিতর যখন রোদ পড়ল তখন সোমনাথ মা ও ছেলেকে ঘুমাতে দেখেছিলেন, তাতে তো আর ভুল নাই। সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত হল, চলন্ত ট্রেণ

থেকে পনের মিনিটের কম সময়ের মধ্যে ছেলে চুরি গেছে, যখন সোমনাথ বাথরুমে ঢুকেছিলেন আর তাঁর স্ত্রী ঘুমাচ্ছিলেন। মজা এই, এর পরেই দেখা গেছল কামরার দুধারের দরজা চাবি-বন্ধ। প্রশ্ন এই, কে বা কারা বন্ধ করল? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সোমনাথ যেভাবে তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন, তাতে চোর বাথরুমে বা কামরার মধ্যে কোথাও ছিল না। তবে কোথায় সে ছিল সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে? চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠে ছেলে চুরি করে পালান সম্ভব হলেও এক্ষেত্রে আমার তা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় নি। তারপর ভক্তের সঙ্গে ওদিক ঘুরে এসে আমি যে জায়গায় ছেলে চুরি হয়েছিল, তা একরকম ধরে ফেলেছি। সেখানে কোন ক্রমেই অত নিচে থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলে চুরি সম্ভব নয়। সুতরাং আমাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করতে হল, ছেলে চোর ট্রেণের মধ্যেই ছিল। রামধনের ছুটে যাওয়ার সঙ্গে ছেলে চুরির কোন সম্বন্ধ নেই, সোমনাথের গিন্নী সেটা সহজ বুদ্ধিতে ঠিকই ধরেছিলেন। আর এই রকম ছেলে চুরি করতে সে যাবেই বা কেন? আমার মনে হয়, সে যে বলেছে তার স্ত্রীর কথা শুনতে পেয়েছিল, তা সত্যি। সে যখন দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নামে তখন তার কাণের কাছাকাছি কেউ তার স্ত্রীর স্বর নকল করেছিল, সে

ঠাহর করতে না পেরে ভেবেছিল সত্যি বোধ হয় স্ত্রী বিপদে পড়েছে। এরকম অনেক হয়। তাই দিগ্বিদিগ-জ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রীর খোঁজে গিয়েছিল। স্ত্রীর অবিশ্বাসের কোন মূল্য নাই, দারোগা ঘটনাস্থানে অনুসন্ধান করে কিছুই পায় নাই।

আমরা হয়তো ছেলে-চোর সম্বন্ধে অন্ধকারেই হাতড়াতে থাকতাম। কিন্তু সোমনাথ বাবুর নামে কৃষ্ণ-বর্ণ খামের চিঠি আসায় প্রথম হদিস বাৎলে দিল। আমি জানতাম, টাকার জন্য খড়্গধারীরা আরও অনেক ছেলে চুরি করেছে। বোঝা গেল, এটাও তাদের কীর্তি, তারা দশ হাজার টাকা চায়। তাহলে বোঝা গেল ছেলে-চোর বা চোরেরা কলকাতা-শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকেই সোমনাথের অনুসরণ করেছিল। এ বিষয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আমি বহু অনুসন্ধান করি, কিন্তু কোন ইঙ্গিত পাই না। কুলি থেকে আরম্ভ করে টিকেট বাবু পর্যন্ত এক কথা বলে, লক্ষ্য করি নি।

সম্ভবত আমাকে ষ্টেশনে ঘোরাফেরা করতে দেখে ওদের মাথায় প্ল্যান খেলল সোমনাথ গিন্নীকে পাটনায় সরাবার একটা মিথ্যা অজুহাতে। তাতে আমি ভক্তকে তাঁর কাছে পাঠালে তারা কৌশলে তাকে বন্দী করবার সুযোগ পাবে। আমি সে ফাঁদে পা দিই নি। উপরন্তু আপনাকে টেলিফোন করেও ওরা ঠকাতে পারে নি, যদিও আমি

ভেবেছিলাম ·টেলিফোন থেকে ওরা ধরা পড়বে, তা হয় নি।

সোমনাথ বাবু, ট্যাক্সি নিয়ে পথে যে বিপদ সেটা আপনাকে মারবার জন্য নয়, ভয় দেখাবার জন্য। চিঠিটা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ায় বিপদ্ ছিল, আপনি জানেন না, হয় আমি নিজে নয় আমার লোক সর্বদা আপনার বাড়ি পাহারা দিয়েছে। সুতরাং গুলি করে মোটরের কাঁচ ভেঙ্গে আপনাকে চিঠি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তার ফল হল, পাঞ্জাবী চালকের জেল।

আপনারা বুঝতেই পারছেন খড়্গধারী দল সাধারণ ডাকাতের দল নয়। এরা পারৎপক্ষে খুন খারাপি করে না। মুখে বলে, আমরা ধন-বণ্টনে সুবিচার করছি। আমাকেও শাসন করতে এরা পিছপাও হয় নি। চিড়িয়াখানায় আমার কাছে লেখা চিঠি তার প্রমাণ। তবে তারা যে চিড়িয়াখানায় আমার গতিবিধির উপর চোখ রেখেছিল, তাতেই জানলাম ওরা বুঝেছিল আমি শীগগির ওদের রহস্য ভেদ করব। হলও তাই। ভঞ্জ, মনে আছে চিড়িয়াখানায় আমি বানরদের সঙ্গে ক'ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম।

—মনে আছে। এখন সব জলের মত সহজ হয়ে গেছে!

—এইবার আমার বলবার কথা ফুরিয়েছে। আমি বুঝলাম, ছেলে-চোর মানুষ নয়। মানুষে করিয়েছে। ছেলে চুরি করেছে বন-মানুষ। আর সেই বন মানুষ চলন্ত গাড়ির ছাদে ছিল। সুযোগ পাওয়া মাত্র ভিতরে ঢুকে ছেলে নিয়ে পালিয়েছে। এই বন-মানুষ অত্যন্ত শিক্ষিত। এরই উপর ভার ছিল সোমনাথের টাকার তোড়া বয়ে নিয়ে যাবার আর গরিলার উপর ভার ছিল ছেলে ফিরিয়ে দেবার। খড়্গধারী দল অতি সাবধানী। মানুষ দিয়ে এ সব কাজ করায় নি। তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি, আমি পাল্টা এমন নূতন আয়োজন করব যে ছেলে-চোর ধরা পড়বে। পুলিশ সাহেব, চোরকে শাস্তি দেওয়ার ভার এখন আপনার। আর আসল চোর ধরবার ভার আমার রইল।

পুলিশ সাহেব হাসিতে হাসিতে সকলের করমর্দন করিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন সোমনাথ-গিন্নী গলার হার আর হাজার টাকা সেই পূর্বের দারোগাকে দিয়া বলিলেন,

—আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম।

পুলিশেরাও যথাযথ পুরস্কৃত হইল।

সমাপ্ত

প্লেটোর রিপাবলিক

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে যে জ্ঞানোজ্জ্বল মনীষী তাঁহার রচনাবলীর দ্বারা শুধু গ্রীস নয়, ইয়োরোপ এবং সমগ্র পৃথিবীর উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ও তাঁহার রচনাবলীকে জানিবার আগ্রহ আপনার নিশ্চয় আছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সক্রেটিস্, প্লেটো, এরিষ্টট্‌ল প্রভৃতি গ্রীক্ চিন্তাবীরগণের দান অনন্যসাধারণ। চিন্তাশীল বাঙ্গালী মাত্রেরই ইঁহাদের সহিত পরিচয় থাকা উচিত। বিদেশী ভাষার দুস্তর ব্যবধান এতদিন আমাদিগকে এই অমূল্য সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। আর আপনাকে সেজন্য মনস্তাপ পাইতে হইবে না। সহজ মাতৃভাষায় এক একটি সুন্দর সংস্করণ আপনাদের হাতে আসিয়া যথাসময়ে পৌঁছিবে এবং আপনাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইবে—এই বন্দোবস্ত আমরা করিয়াছি।

প্রথমে প্লেটোর রিপাবলিক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইবে। ইহার পর ক্রমে ক্রমে প্লেটো ও অন্য গ্রীক চিন্তাবীরদিগের পুস্তকাবলী প্রকাশিত হইবে।

যাহা কল্পনার অতীত ছিল, সমগ্র প্লেটোর রিপাবলিকের বাংলা অনুবাদ আপনি অতি সহজে পড়িতে পারিবেন। নগদ মূল্য বাঁধাই অনুসারে ১১ খণ্ড ৫৫৲ টাকা ও ৬৮৷৷০ টাকা। ১১ খণ্ডের জন্য একত্রে টাকা জমা দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম পড়িবে।

শ্রীসুধাকান্ত দে

৫৮।৪, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।